চতুর্থ অধ্যায়
সমকালীন নাট্যকর্মী ও বাদল সরকার

বাদল সরকারের সমসময়ে বা প্রায় সমসময়ে বাংলা থিয়েটারে আবির্ভূত হন বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত কিংবা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নাট্যব্যক্তিত্ব। এঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের নাট্যকর্মের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা থিয়েটারকে একটা উচ্চতর স্থানে যে নিয়ে গেছেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। গতানুগতিক বাণিজ্যিক থিয়েটারের ধারা থেকে সরে এসে বাংলা থিয়েটারে এক স্বতন্ত্র নাট্যাভিনয়ের ধারার সূচনা করেন বিজন ভট্টাচার্য। তাঁর হাত ধরেই নাট্যাভিনয়ের জগতে প্রথম একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। শম্ভু মিত্র ও তাঁর 'বহুরূপী' নাট্যদল ষাট-সত্তরের দশকে প্রবলভাবে বাংলা থিয়েটারে প্রায় একছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছিল। অভিনয়, উপস্থাপনার সর্বাঙ্গীন মান-এ শম্ভু মিত্র ও বহুরূপী নাট্যদল তখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে। অন্যদিকে উৎপল দত্ত প্রথমে 'লিটিল থিয়েটার গ্রুপ' ও পরবর্তিতে 'পিপলস থিয়েটার নিয়ে একের পর এক নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে বাংলা থিয়েটারে তিনিও একটি স্বতন্ত্র ধারা নির্মাণ করেছেন। নাটকের বিষয়ের বিস্তারে, ভাবনার প্রকাশে এবং উপস্থাপনার মুন্সিয়ানায় বাংলা নাটক ও নাট্যাভিনয়কে একটা ভিন্ন স্তরে পৌঁছে দেন। উৎপল দত্তের পরে পরেই বাংলা থিয়েটারের আবির্ভাব ঘটে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। শম্ভু মিত্র এবং উৎপল দত্তের দ্বিমুখী নাট্যপ্রযোজনা বিভিন্ন বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষের পাশে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় আর এক ভিন্নমুখী ধারা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। এই চারজন নাট্যব্যক্তিত্বের মধ্যে বিজন ভট্টাচার্য বাদল সরকারের অনেকটাই পূর্ববর্তীকালের। আর শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় সময়ের দিক থেকে তাঁরা নিকটবর্তী এবং বাদল সরকার তাঁদের সামসাময়িক। ভবেশ দাশ এ সম্পর্কে লিখেছেন,

> ''শম্ভু মিত্র উৎপল দত্ত আর অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এই তিনটে নাম একইসঙ্গে উচ্চারিত হয়... যেন নাট্যের একটা যুগ বোঝাতে এই তিনটে নামেরই উচ্চারণ অনিবার্য।''[১]

আমরা এই অধ্যায়ে সমকালীন এই প্রথিতযশা নাট্যব্যক্তিত্বের নাট্যকর্মের বিশেষ অবদান ও আঙ্গিকের উল্লেখে নাট্যকর্মী বাদল সরকারের নাট্যকর্মের অবস্থান নির্ণয় করার চেষ্টা করব। নাট্যসৃজনের ক্ষেত্রে কোন কোন দিক থেকে এঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি করেছেন সেটিই এই আলোচনায় তুলে ধরা হবে। মনে রাখতে হবে, শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়— তিনজনেরই নাট্যভাবনার বুনিয়াদ তৈরি হয় গণনাট্য সঙ্ঘের পরিমণ্ডলে। আর সেই সূত্রে গণনাট্য

সঙ্ঘের কথাও এখানে উঠে আসে। এই কারণে আমরা এখানে গণনাট্য সঙ্ঘের একজন অন্যতম প্রতিনিধি স্থানীয় নাট্যব্যক্তিত্ব বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যকর্মের স্বরূপ অন্বেষণের মধ্য দিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেছি। তাঁকে বাদ দিয়ে শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা বাদল সরকারের নাট্যকর্মের মূল্যায়ন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বলা বাহুল্য বাদল সরকারের সমকালে আরো বহু খ্যাতনামা নাট্যব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছিল যাঁরা তাঁদের অসাধারণ নাট্যসৃজন কর্মের দ্বারা স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা নাট্যের ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন। নাট্যক্ষেত্রে তাঁদের অবদান কোনোদিক থেকেই অস্বীকার করার নয়। তাঁদের মধ্য থেকে আমরা উক্ত কয়েকজন নাট্যকারকে আলোচনার কেন্দ্রে এনেছি এই কারণে যে তাঁরা প্রত্যেকেই বাংলা থিয়েটারের জগতে একজন প্রতিনিধি স্থানীয় নাট্যব্যক্তিত্ব। তাঁরা প্রত্যেকেই গতানুগতিক থিয়েটার ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে নাট্যজন প্রক্রিয়াকে এক একটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করেছেন।

আমরা শুরুতেই আলোচনা করবো বাংলা প্রগতিশীল গণনাট্য আন্দোলনের পথিকৃৎ বিজন ভট্টাচার্যের (জন্ম-১৭ই জুলাই, ১৯১৭ ফরিদপুর; মৃত্যু- ১ জানুয়ারি, ১৯৭৮) নাট্যকর্ম সম্পর্কে। বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যজীবন শুরু হয় চল্লিশের দশকে। বাংলা থিয়েটারের তখন বন্ধ্যাদশা। তখন নতুন নাট্যচেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে পেশাদার রঙ্গমঞ্চগুলি। যে থিয়েটার আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে আমাদের ঔপনিবেশিক প্রভুদের কাছ থেকে পেয়েছিলাম তা জীর্ণ হতে হতে, ক্লান্ত হতে হতে এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছিল যাতে কেবল কিছু স্বয়ম্ভু অভিনেতা তাঁদের দাপট দেখাবেন আর নাটক সেই দাপটকে আরো উচ্চকিত করে তুলবে, এই ছিল তখন থিয়েটারগুলির একমাত্র ভূমিকা। আর নাটকের বিষয়? কখনো ইতিহাস, কখনো পুরাণের আশ্রয়ে নিতান্ত পারিবারিক সুখ-দুঃখের কাহিনি। বাণিজ্যিক থিয়েটারগুলিতে এভাবেই অভিনয় চলছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, নতুন সমাজতান্ত্রিক চিন্তাচেতনা, এদেশে পঞ্চাশের মন্বন্তরের করালগ্রাস, স্বাধীনতা আন্দোলনের দুর্বার জোয়ারে বাংলা থিয়েটারের সব জীর্ণতা ধুয়েমুছে তৈরি হলো এক স্বতন্ত্র নাট্যআন্দোলন— গণনাট্য আন্দোলন। এই আন্দোলনের সূচনা করেন কিছু ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক শিল্পী গোষ্ঠী। এঁদেরই সংস্কৃতির শাখা ছিল ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বা ইণ্ডিয়ান পিপলস্ থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন যা আই.পি.টি.এ. নামে পরিচিত। এই গণনাট্য সংঘের সঙ্গে যুক্ত থেকেই বিজন ভট্টাচার্যের নাট্য জীবনের সূত্রপাত ও বিকাশ। গণনাট্য সংঘের মূল উদ্দেশ্য ছিল নাটক উপস্থাপনার মাধ্যমে সাম্রাজন্যবাদ, শোষণ ও যাবতীয় প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে মানুষকে জাগিয়ে তোলা এবং নিপীড়িত জনগণকে পাদপ্রদীপের আলোয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা। অভিনয়ের ব্যাপারে স্থির করা হয় যে পুরোনো নাটকের বদলে এমন নাটক অভিনয় করা হবে যার মাধ্যমে প্রকাশ পাবে একালের কথা

অর্থাৎ যেসব ভয়াবহ জটিল বৃহৎ সমস্যা যা সকল নিপীড়িত মানুষের বক্তব্য হয়ে উঠবে। কিন্তু তেমন নাটক কোথায়? তেমন নাট্যকর্মী বা কোথায়? ঠিক এই সময় বাংলা থিয়েটারের জগতে উঠে এলেন বিজন ভট্টাচার্য। যিনি নিজেও বিশ্বাস করেন শিল্প সাহিত্য হবে মানুষের জন্য। বিজন ভট্টাচার্য দীর্ঘদিন আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক ছিলেন, সেই সূত্রেই সাধারণ মানুষের জীবন ও যন্ত্রণার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছেন। কীভাবে তিনি নাটকে এলেন? শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন,

> ''... স্মৃতিচারণায় বলেছেন বিজনদা, ডি এন মিত্র স্কোএরের গা দিয়ে তাঁকে যেতে হত, যে রাস্তায় তখন তিনি থাকতেন, ডা. রাজেন্দ্র রোড, ভবানীপুরে। যেতে যেতে লক্ষ করতেন যে, ওই স্কোএরে বহু দুর্ভিক্ষপীড়িত, দুর্ভিক্ষতাড়িত মানুষ, তারা ওইখানে বাস করে, দিনযাপন করে। নারী, পুরুষ, শিশু। বিজনদা স্মৃতিচারণায় বলেছেন, 'আমি যখন ওখান দিয়ে যেতাম, আমি লজ্জায়, গ্লানিতে, অপরাধবোধে কোনোদিন মুখ তুলে চাইতাম না। বারবার মনে হত আমরা তো কিছু করতে পারি না, আমরা তো কিছু করি না, কী করে তাকাব ওদের দিকে?''[২]

এই মানুষগুলোর কথা তিনি বলতে চেয়েছেন। কিন্তু কীভাবে বলবেন? তখন তাঁর মনে হয়েছে সেটা সাহিত্যের অন্য কোনো বাহনে শোনানো যায় না, তার কারণ অন্য যে কোনো বাহনে লেখকের এমন একটা প্রভুত্ব থাকে, এমন একটা আধিপত্য থাকে, যে লেখক যেন সব জেনে-বুঝে বসে আছেন, সেখান থেকে এদের কথা বলা যায় না। তখনই তাঁর মনে হয়,

> ''যদি ওরা নিজেদের কথা নিজেরা বলে, তবেই হতে পারে। এবং সেখান থেকে কোথাও মনে হয় যে, সেই বাহন হতে পারে কেবলমাত্র নাটক। যেখানে... তিনি নিজেকে নাটকের মাঝখানে এনে স্থাপন করবেন না। তিনি বাইরে থাকবেন, দূরে থাকবেন, সরে থাকবেন, আর এই নাটকের মানুষগুলো মানুষ হয়ে উঠবে নাটকের চৌহদ্দির মধ্যে-তার স্বতন্ত্র স্বাধীন চৌহদ্দির মধ্যে-নাট্যকার সুতোর টানে তাদের খেলাবেন না।''[৩]

এই তাগিদ থেকেই বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যজগতে আসা। আর একই কারণে যুক্ত হয়ে পড়েন গণনাট্য সংঘের সঙ্গে। এই গণনাট্য সংঘের জন্যই এরপর লিখতে থাকেন একের পর এক নাটক। নাটক রচনা, অভিনয় এবং নির্দেশনা সবকিছুই পরিচালিত হয় গণনাট্যের আদর্শ মেনে। গণনাট্য সংঘের ঘোষিত নীতি হলো, শিল্প হবে মানুষের জন্য। এই ভাবধারায় তাঁর প্রথম প্রচেষ্টা 'আগুন'

নাটক। এটি একটি একাঙ্ক নাটক। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রযোজনায় নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৪৩ সালের ২৩ মে নাট্যভারতী মঞ্চে। অভিনয়ে ছিলেন সুধী প্রধান, তৃপ্তি ভাদুড়ী (মিত্র) প্রমুখ। পরিচালনায় এবং প্রধান ভূমিকায় ছিলেন স্বয়ং বিজন ভট্টাচার্য। এরপর তিনি লিখলেন 'জবানবন্দী'। গণনাট্য সংঘের পক্ষ থেকে ১৯৪৪-এর ৩ জানুয়ারি স্টার থিয়েটারে নাটকটি অভিনীতি হয়। সুধী প্রধানের 'নবনাট্য আন্দোলন প্রসঙ্গে' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে জানতে পারি এই নাটকের পরিচালনায় ছিলেন শম্ভু মিত্র। এই নাটকটিতে অভিনয় করেছিলেন বিজন ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বসু, সুধী প্রধান, তৃপ্তি ভাদুড়ী, বাণী চক্রবর্তী, রবীন মজুমদার প্রমুখ। এই নাটকে প্রথাগত নাটকের মতো গান নেই, হাসি নেই, নাটুকে সংলাপ নেই, আছে একেবারে সহজ, সুস্পষ্ট নাট্যঘটনা। সন্ধ্যা দে এই নাটকের মূল্যায়ন করতে গিয়ে যথার্থই বলেছেন,

> ''জবানবন্দী'-কে পুরো নাটক না বলে চিত্র বা নক্শা বললেই ঠিক বলা হবে। এক কথায় বলা যেতে পারে, ঐতিহাসিক মহা মন্বন্তরের পটভূমিকায় বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী-র জন্ম, সচেতন জনজীবনের রূপকার গণনাট্যের জন্ম।''[৪]

'জবানবন্দী'-র পর বিজন ভট্টাচার্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক 'নবান্ন'। প্রথম অভিনীত হয় ১৯৪৪-এর ২৪ অক্টোবর শ্রীরঙ্গম মঞ্চে। শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য নাটকটির যুগ্ম পরিচালনার ভার নেন। মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, সুধী প্রধান, গঙ্গাপদ বসু, শোভা সেন, তৃপ্তি ভাদুড়ী, মণিকুন্তলা সেন প্রমুখ। এই নাটকটি বস্তুত মরণবিজয়ী গ্রামীণ কৃষক সমাজের অন্তরের বলিষ্ঠ আশাবাদেরই প্রতীক। গণঅভিনয়ের মাধ্যমে, গণজীবনকে তুলে ধরা, গণসঙ্গীতের ব্যবহার, চট দিয়ে মঞ্চসজ্জা, তাৎপর্যপূর্ণ আলোর প্রয়োগ দারিদ্র্যের প্রতিফলন স্বরূপ সব কিছু মিলিয়ে 'নবান্ন' সেদিন গণনাট্য আন্দোলনের তরঙ্গশীর্ষ স্পর্শ করেছিল। এরপর তিনি একে একে রচনা করেন 'অবরোধ', 'জীয়ন কন্যা', 'মরাচাঁদ', 'কলঙ্ক', 'গোত্রান্তর' প্রভৃতি নাটক। তবে স্বাধীনতার পর থেকেই ধীরে ধীরে গণনাট্য সঙ্ঘ-এ ভাঙ্গন শুরু হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, তীব্র মতানৈক্য— এই সবকিছু গণনাট্য আন্দোলনের ওপর চরম আঘাত নেমে আসে। স্বাধীনতার পর ১৯৪৯-এ কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হয়। আরো অনেক কারণেই গণনাট্য আন্দোলনের উপর মর্মান্তিক আঘাত নেমে আসে, তখন গণনাট্যের ভাঙন রোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ১৯৪৮-এ গণনাট্য সংঘ থেকে বেরিয়ে এসে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বসু, তৃপ্তি মিত্র প্রমুখকে নিয়ে শম্ভু মিত্র গঠন করলেন 'বহুরূপী নাট্যগ্রুপ', ১৯৫০-এ উৎপল দত্ত তৈরি করলেন 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ', আর বিজন ভট্টাচার্য ১৯৫১-তে তৈরি করলেন নিজের নাট্যদল 'ক্যালকাটা থিয়েটার'

(১৯৫১-৭০)। অবশ্য গণনাট্য সংঘ থেকে বেরিয়ে এলেও তখনও গণনাট্য সংঘের আদর্শ ও ভাবধারা থেকেই তিনি সরে আসতে পারেননি। এই পর্বে লেখা হল, 'ছায়াপথ' (১৯৬১), 'মাস্টারমশাই' (১৯৬১), 'কৃষ্ণপক্ষ' (১৯৬৬), 'ধর্মগোলা' (১৯৬৬), 'দেবীগর্জন' (১৯৬৬), 'গর্ভবতী জননী' (১৯৬৯) এর মতো নাটক। এই পর্বে লেখা নাটকগুলির মধ্যে— এক অর্থে 'নবান্ন' উত্তর পর্বে বিজন ভট্টাচর্যের লেখা সবচেয়ে আলোচিত নাটক হল 'দেবীগর্জন'। নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৬৬-র ২১ফেব্রুয়ারি ওয়েলিংটন স্কোয়ারে জাতীয় সংহতি সম্মেলন উৎসবে। নির্দেশনায় ছিলেন স্বয়ং বিজন ভট্টাচার্য। মঞ্চ পরিকল্পনা আবহসংগীত আলোকসম্পাত রূপসজ্জায় ছিলেন যথাক্রমে খালেদ চৌধুরী, প্রদীপ চক্রবর্তী ও শক্তি সেন। সঙ্গীত ও সুর সৃষ্টিতে ছিলেন স্বয়ং নাট্যকার। আর অভিনয় করেছিলেন, কালী মুখোপাধ্যায়, শ্যামল ঘোষ, চন্দন লাহিড়ী, বিজন ভট্টাচার্য প্রমুখ। পচাগলা সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার বিসর্জনের বাজনার তালে তালে ভুঁইচাষীদের কণ্ঠে নতুনকালের 'দেবীগর্জন' এখানে ধ্বনিত হয়েছে। বীরভূমের আদিবাসী সাঁওতাল কৃষক সম্প্রদায়ের জীবন সংগ্রামের কাহিনির প্রেক্ষাপটে, তিনি এখানে মেহনতী মানুষের সংগ্রামের এক নতুন ইতিহাস নির্মাণ করেছেন। পৌরাণিক রূপকল্প ও একালের শ্রেণিসংগ্রাম মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে এই নাটকে।

দেবীগর্জন-এর পর বিজন ভট্টাচার্য ও তাঁর দল ক্যালটাকা থিয়েটার নামায় 'গর্ভবতী জননী'। মুক্ত অঙ্গনে নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৬৯-এর মে মাসে। নাটকের পরিচালনায় বিজন ভট্টাচার্য। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন, বিজন ভট্টাচার্য, সৌমেন মজুমদার, শ্যামল ঘোষ, বিজয় চক্রবর্তী, ছন্দা চ্যাটার্জী প্রমুখ। নাটকটির আবহসংগীত, মঞ্চ ব্যবস্থা, রূপসজ্জা ও আলোকসম্পাতে ছিলেন যথাক্রমে মুরারী ধর, তরুণতপন লাহিড়ী, অনাথ মুখোপাধ্যায় ও দেবব্রত মল্লিক। নাটকের পটভূমি একটি গ্রাম, দারিদ্র্য যেখানকান মানুষের নিত্য সঙ্গী। জঙ্গল থেকে গাছ-গাছরা সংগ্রহ করাই এই গ্রামের স্থানীয় অধিবাসীদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র পথ। সুযোগ সন্ধানী পাইকাররা তাদের শোষণ করে। তাদের শয়তানি বুদ্ধিতে নাজেহাল হয়েও ওরা বাঁচে। 'গর্ভবতী জননী'র গল্প বলতে এটুকুই। কিন্তু এই সামান্য বিষয় সম্বল করে নাট্যকার আমাদের নিয়ে যান এক অন্য জগতে। একটি মাত্র সেট, প্রশস্ত একটি চত্বরই ঘটে চলে পুরো নাট্যঘটনা। যেন একটি গোটা গ্রাম বাংলা প্রাণ পেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। আর এখানেই পরম বেদনায় ধ্বনিত হয়ে উঠেছে সেই সর্বনাশা সময়, যখন পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত সন্তানেরা তাদের জননীকেও চিনতে পারে না। বিজন ভট্টাচার্যের এ এক অসাধারণ নাট্যসৃষ্টি। আনন্দবাজার পত্রিকা তাদের ৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০ সংখ্যায় নাটকটির প্রশংসা করে একটি লেখা প্রকাশ করে। তার উল্লেখ পাই নাট্যগবেষক, অভিনেত্রী সন্ধ্যা দে-র একটি গ্রন্থে। আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখা হয়,

''না, শুধু গ্রাম আর মানুষ, মাটি মন আর বিশ্বাসই গর্ভবতী জননীর শেষ কথা নয়। নাটক শেষ হলে আসন ছাড়তে ভুলে গিয়েছিলাম। গর্ভবতী জননী তবে কী? প্রতিকী নাটক? ভিন্নতর জীবনদর্শনের এক দৃশ্যকাব্য? হ্যাঁ তাই। আমরা ধরে নিতে পারি এই গ্রাম অতীতের ভারত, আজকের ভারত এবং ভবিষ্যতেরও। সারল্য আর বুদ্ধির যে দ্বন্দ্ব তা চিরকালীন।''[৫]

এরপরে তিনি সত্তরের দশকের গোড়াতেই ক্যালকাটা থিয়েটার থেকে সরে এসে আবার 'কবচকুণ্ডল' নামে নতুন একটি নাট্যদলের প্রতিষ্ঠা (১৯৭০-৭৮) করেন। এই পর্ব থেকেই নাট্যকারের মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসের সঙ্গে সমান্তরালভাবে লোকায়ত ধর্ম, হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। ''স্বয়ং নাট্যকার নিজের মুখে উচ্চারণ করেছিলেন, 'আমিও বিভ্রান্ত'। তীব্র সংলগ্নতা ও আবেগ তীব্রতা চেনাভঙ্গী পরিহার করে এখানে নাট্যকারকে দেখা যায় নিরাসক্ত দার্শনিকের ভূমিকায়।''[৬] এই পর্বের লেখা নাটকগুলির নাট্য প্রযোজনার মধ্যে এই ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

কবচকুণ্ডল পর্বে বিজন ভট্টাচার্যের প্রথম নাটক 'সোনার বাংলা'। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় রচিত এই নাটকটি বাংলাদেশ মৈত্রী পরিষদের উদ্যোগে ও কবচকুণ্ডল-এর প্রযোজনায় প্রথম পরিবেশিত হয় ইডেন গার্ডেন-এ। নির্দেশনায় ছিলেন ভট্টাচার্য নিজেই। কবচকুণ্ডল পর্বে তাঁর দ্বিতীয় নাটক 'কৃষ্ণপক্ষ'। নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ১২ জানুয়ারি, ১৯৭৫-এ, রবীন্দ্রসদন মঞ্চে। বহু চরিত্র নিয়ে বিশাল দলগত এই প্রযোজনায় নির্দেশক ও সংগঠক হিসেবে বিজন ভট্টাচার্য এই নাটকে এক সম্পূর্ণ নতুন ভূমিকা পালন করেন। ওই একই বছরে ২২ শে মার্চ রবীন্দ্রসদন নাট্যোৎসবে কবচকুণ্ডল প্রযোজনা করে বিজন ভট্টাচার্যের রচিত ও নির্দেশিত নাটক 'আজ বসন্ত'। এই নাটকে মাত্র চারটি চরিত্র। অভিনয় করেছিলেন বিজন ভট্টাচার্য, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, মঞ্জুশ্রী বসু ও রামকৃষ্ণ সিন্‌হা রায়। সঙ্গীত সৃষ্টি ও আলোকসম্পাতে নাটকটিকে রীতিমত বাঙ্ময় করে তুলেছিলেন দীপক চৌধুরী ও তাপস সেন।

জীবন ও ভালোবাসাকে গ্রাস করার জন্য একালের কঠিন পরিবেশে যে প্রতিকূলতা ও সংকট তৈরি হচ্ছে নাট্যকার সেই অসহায় পরিস্থিতির একটি বেদনাময় কাহিনি এখানে তুলে ধরেছেন। নাটকের নায়ক তরুণ প্রেমিকটি উপলব্ধি করে যে চারদিকে কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যে যৌবন ভালোবাসাকে পিষে ফেলার ষড়যন্ত্র চলছে। আপাতত নিরীহ এই কাহিনির মধ্যে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প, লুবিয়াংকা, কারাগাণ্ডা ইত্যাদি আন্তর্জাতিক নির্যাতন প্রসঙ্গ এনে বিজন ভট্টাচার্য নাটকটির সীমাকে কখনো কখনো আন্তর্জাতিকতায় পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

বিজন ভট্টাচর্যের শেষ নাটক 'চলো সাগরে'। স্বপ্নভঙ্গের বেদনা নিয়ে রচিত এই নাটকে

সমকালীন বাম ঘেঁষা নাট্যপ্রয়াসের প্রতি তীব্র বিদ্রুপ বর্ষিত হয়েছে। নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ১৯৭৭-এর ৩০ মার্চ, তপন থিয়েটারে। নির্দেশনার দায়িত্ব ছিলেন বিজন ভট্টাচার্য। অভিনয় করেন বিজন ভট্টাচার্য, সমরেশ মজুমদার, অসিত মুখার্জি, অশোক চক্রবর্তী এবং বিশিষ্ট অভিনেত্রী মলিনাদেবী। এই নাটকের মঞ্চ আলো রূপসজ্জা ও সঙ্গীতের দায়িত্বে ছিলেন যথাক্রমে দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, শক্তি সেন প্রমুখ। তবে দুর্বল প্রযোজনা ও সংগঠনের ত্রুটির জন্য নাটকটি সেই অর্থে মঞ্চসফল হতে পারেনি।

বিজন ভট্টাচার্য তো শুধুমাত্র নাটককারণ নয়, একজন দক্ষ নাট্যসংগঠনও। নাটক রচনা থেকে নাট্যপ্রযোজনা সর্বত্রই তিনি প্রসেনিয়াম থিয়েটারের মধ্যে থেকেও নিজের স্বতন্ত্র নাট্যভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। অনেকে বিজন ভট্টাচর্যের নাটকের সমালোচনা করে বলেন যে তাঁর নাটকগুলি অনেক বেশি আলগা, শৃংখলাবদ্ধ নয়, তার নাটক গোছানো নয়, সাজানো নয় সুচারুরূপে বিন্যস্ত নয়। কিন্তু বিজন ভট্টাচার্যের নাটক সম্পর্কে এই ধরনের সমালোচনা ঠিক নয়। আসলে যে নাট্যশৃঙ্খলার কথা বলা হয়, তা তো বিলেতি নাটক থেকে আমদানিকৃত নাট্যশৃঙ্খলা। সেই শৃঙ্খলা নাটকের কোন স্বভাবজাত ধর্ম নয়। এটা একধরনের চাপিয়ে দেওয়া প্রথা, নাটককে বেঁধে রাখার প্রয়াস। বিজন ভট্টাচার্যের নাটক এই বন্ধন থেকে মুক্ত। থিয়েটারের সীমিত হিসেবিপনার মধ্যে তিনি নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। এ প্রসঙ্গে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় যে মূল্যায়ন করেছেন তা এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন,

> ‘‘... যেহেতু বিজনদা নাটকের ওই রকম একটা পূর্বনির্ধারিত বিন্যাসকে অবধারিত বলে গ্রহণ করেননি, যেহেতু বারবার একেকটা সামাজিক, ঐতিহাসিক সংকটের মুহূর্তে দাঁড়িয়ে, একেকটা সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, তাঁকে আবার নাটকে আসতে হয়েছে, নাটক তৈরি করতে হয়েছে, কোনো বাঁধা ধরা নাটকের পথ তিনি গ্রহণ করেননি।’’[৭]

আমরা বলবো এখানেই বিজন ভট্টচার্য স্বতন্ত্র। আরো বহু বিষয় থেকে বিজন ভট্টাচার্য গতানুগতিক ধারাকে ভেঙেছেন। আমরা যদি নাটকের ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখব একটা সময় ছিল যখন নাটক মানেই যেন দর্শকের কাছে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের রং ঢং-এ সাজ। নাটকের পাত্র-পাত্রীদের কথা বলার ভঙ্গিও যেন সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা, সম্পূর্ণ পৃথক। সবসময় একটা নাটকীয়তা তাতে বজায় থাকতো। বিজন ভট্টাচার্য এই প্রথা থেকে সরে আসলেন। তাঁর নাটকের চরিত্রগুলো নিজেরাই নিজেদের কথা বলে, বাইরে থেকে কোনকিছু চাপিয়ে দেওয়া হয় না। ফলে দর্শকরা আর মঞ্চে স্বর্গলোকের মানুষকে দেখলো না, তারা যেন তাদেরই পরিচিত কোন

এক গ্রামের দুর্গত বা নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষ। যেখানে কোন সাজসজ্জার বাহুল্য নেই, নেই কোন অতিনাটকীয়তা। বিজন ভট্টাচার্যের নাট্য ভাবনার আরেকটা নতুনত্ব হলা তিনি পথকে মঞ্চে তুলে এনেছেন। তাঁর 'জবানবন্দী', 'নবান্ন', 'দেবীগর্জন'-র মতো বেশকিছু নাটক আছে যেগুলির শিকড় বাংলার মাটিতে। তাঁর নাটকের মানুষগুলি যেন জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত বাঙালি। এরা অধিকাংশই গ্রাম বাংলার প্রতিনিধি। তারাই নাটকের প্রাণ।

নাট্য প্রযোজনা ক্ষেত্রেও বিজন ভট্টাচার্য পুরাতন ঐতিহ্য থেকে সরে এলেন, নির্মাণ করলেন এক স্বতন্ত্র ধারা। এতদিন নাটকে মঞ্চসজ্জার জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হত বিজন ভট্টাচার্য নানা পদ্ধতিতে সেই খরচ কমিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন। দর্শক যাতে বুঝতে পারে কোনটা ড্রইংরুম কোনটাপ ফুটপাত আর কোনটা ধনী বিত্তশালীর ঘর, তার জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকুই তিনি করলেন। মঞ্চে বস্তুভার অনেক কমিয়ে আনলেন। অবশ্য এই সবের মূলে কাজ করেছে গণনাট্য সংঘের প্রেরণা। কেননা গণনাট্য সংঘের ঘোষিত নীতিই হলো, নাটক হবে সাধারণ মানুষের জন্য, তাদের নিয়েই রচিত হবে নাটক। আর এই নাটক যেহেতু সাধারণের, তাই গ্রাম-গঞ্জে ছুটতে হবে নাট্যকর্মীদের। ফলে বিশাল মাপের বস্তুভার হলে সেগুলি বহন করে নিয়ে যাওয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সেই বস্তুভার কমাতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই খরচ কমে গেল। পুরাতন পথ থেকে সরে এসে নির্মাণ করলেন এক স্বতন্ত্র ধারা। ঋত্বিক ঘটকের মতে বলা যায়— বিজন ভট্টাচার্যই প্রথম দেখালেন কি করে জনতার প্রতি দায়িত্বশীল হতে হয়, কি করে সম্মিলিত অভিনয় ধারার প্রবর্তন করা যায় এবং কি করে বাস্তবের একটা অংশের অখণ্ডরূপ মঞ্চের উপর তুলে ধরা যায়।

মঞ্চস্থ উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও বিজন ভট্টাচার্য গতানুগতিক ধারা থেকে সরে এসেছেন। যেহেতু তাঁর নাটকের বেশিরভাগ চরিত্রই নিম্নবিত্ত শ্রেণি থেকে উঠে আসা, ফলে রাজা-মহারাজার সাজ-পোশাকের এতদিনকার ঐতিহ্যের পরিবর্তে তা হয়ে উঠলো অতি সাধারণ। নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে তাঁর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো দেশজ সংস্কৃতির ব্যবহার। 'নবান্ন' নাটকে গ্রামীণ জীবনকে তুলে ধরেছেন চটের মতো সাধারণ উপকরণ ব্যবহার করে। চটের সরল সহজ সেটের ব্যবহার করে সেদিন তিনি দর্শককে চমকে দিয়েছিলেন। 'জীয়নকন্যা' নাটক তো লোকায়ত দেশজ গীতিপালার এক অনন্য নিদর্শন।

বিজন ভট্টাচার্য যেহেতু নিজে একজন অভিনেতা ফলে তিনি অভিনয়ের খুঁটিনাটি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। তাঁর অভিনয় ভঙ্গির মধ্যে কোন আবেগের আতিশয্য নেই। নেই কোন অতিনাটকীয়তা। অবশ্য শুধু বিজন ভট্টাচার্য নয়, গণনাট্য সংঘের শিল্পীরা এতদিন ধরে যে অভিনয় রীতি চলে আসছিল তার থেকে অনেকাংশেই সরে এলেন। এই সব শিল্পীদের মধ্যে শম্ভু মিত্র ছাড়া

কিন্তু কেউই পেশাদারী মঞ্চে অভিনয় শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না। তারা পেশাদারী মঞ্চের অভিনয়ের ঐতিহ্যকে প্রায় অস্বীকারই করলেন। শুধুমাত্র শম্ভু মিত্র এবং বাকি দু-একজনের অভিনয়ের মধ্যে পেশাদারী থিয়েটারের সুরেলা, আবৃত্তিমূলক, নাসিক্য উচ্চারণ এবং শব্দ প্রয়োগের কুশলতা কাজ করেছিল। বাকিটা অভিনয় করতে এসে জীবন থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে জীবনের তাগিদেই অভিনয় করে গেছেন। অভিনেতা বিজন ভট্টাচার্য এই নতুন অভিনয় ধারার অন্যতম পথপ্রদর্শক।

বিজন ভট্টাচার্য শুধু একজন অভিনেতা নন তিনি একজন অভিনয় শিক্ষকও। তিনি মনে করতেন, নন অ্যাকটিং ইজ দি বেস্ট অ্যাকটিং। তিনি মনে করতেন অভিনয় তৈরি করে চরিত্র চৈরি করা যায় না চরিত্রের মধ্য থেকেই অভিনয় বের করে আনতে হয়। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথোপকথনে তিনি বলেছেন,

> ''... যিনি অভিনয় করবেন তিনি কতটা অভিনেতা বা অভিনেত্রী আমার তা জানার দরকার নেই। আমি যা জানতে চাই ... চরিত্রের সঙ্গে চেতনার স্তরে, বোধের স্তরে তার কতটা আত্মীয়তা আছে। ... অভিনয় তৈরি করে ... চরিত্র তৈরি করা যাবে না। ... চরিত্রের মধ্য থেকে অভিনয়কে আহরণ করতে হয়।''[৮]

বাংলা তথা ভারতীয় নাট্যজগতের আর এক অন্যতম কিংবদন্তি নাট্যকর্মী হলেন শম্ভু মিত্র (জন্ম ২২ আগস্ট ১৯১৫, দক্ষিণ কলকাতায়, ডোভার রোড, মৃত্যু- ১৯ মে ১৯৯৭)। শম্ভু মিত্রের নাট্যজীবন শুরু হয় চল্লিশের দশকে, পেশাদারী থিয়েটারে অভিনয় দিয়ে (১৯৩৯-৪২)। ১৯৩৯ সালে অভিনেতা হিসেবে যোগ দেন রঙমহল থিয়েটারে। এখানে বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মাটির ঘর', 'মালা রায়', 'রত্নদ্বীপ' প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করেন। এই খানেই মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। যিনি নাট্যক্ষেত্রের 'মহর্ষি' নামেই অধিক পরিচিত। তাঁর সঙ্গে শম্ভু মিত্রের ঘনিষ্ঠতা এবং স্নেহভাজন হতে সময় লাগেনি। রঙমহল উঠে গেলে শম্ভু মিত্র এরপর যোগ দেন মিনার্ভা থিয়েটারে। এখানে তাঁর প্রথম অভিনয় ৭ই জুন ১৯৪০, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর পরিচালনায় ধীরেন মুখোপাধ্যায়ের 'জয়ন্তী' নাটকে। বিপরীতে ছিলেন তৎকালীন জনপ্রিয় অভিনেত্রী অপর্ণা দেবী। মিনার্ভায় এটিই শম্ভু মিত্রের একমাত্র অভিনয়। পরবর্তীতে মিনার্ভার মালিক দিলওয়ার হোসেন কর্তৃক মনোরঞ্জন ভট্টাচর্যের অসম্মানের প্রতিবাদে শম্ভু মিত্র মিনার্ভা ছেড়ে বেড়িয়ে আসেন। ১৯৪১-এ শম্ভু মিত্র যোগ দেন নাট্যনিকেতন মঞ্চে। অভিনয় করেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী' এবং বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মাটির ঘর' নাটকে। ১৯৪১-এর শেষ নাগাদ নাট্যনিকেতন উঠে যায়। পরে নাট্যনিকেতন-এর বাড়িটি কিনে নেন শিশির ভাদুড়ী। শিশিরকুমার ভাদুড়ী সেখানে প্রতিষ্ঠা করলেন শ্রীরঙ্গম মঞ্চ। ১৯৪১-এর অক্টোবর, মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচর্যের সূত্রে শম্ভু মিত্র যোগ

দিলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ীর শ্রীরঙ্গম মঞ্চে। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নির্দেশনায় ২৮ নভেম্বর ১৯৪১, অভিনয় করলেন তারাকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'জীবনরঙ্গ' নাটকে। এই নাটকে নাট্যকার বলে একটি ছোট্ট চরিত্রে তিনি অভিনয় করেন। এরপর তিনি পরপর অভিনয় করলেন, 'সীতা', 'রীতিমতো নাটক', 'আলমগীর'-এর মতো নাটকে। 'সীতা'-য় শত্রুঘ্ন 'আলমগীর'-এ দিলীর খাঁ, 'রীতিমতো নাটক'-এ ডাক্তার চরিত্রে অভিনয় করেন তিনি। মোটামুটি এই ছিল শ্রীরঙ্গম মঞ্চে শম্ভু মিত্রের নাট্যাভিনয়ের অভিজ্ঞতা।

> ''শিশিরকুমারের শ্রীরঙ্গমে তিনি যোগ দেন ১৯৪১-এর অক্টোবর নাগাদ, ছিলেন মোটামুটি আট মাস, ১৯৪২-এর মে পর্যন্ত। ঢুকেছিলেন যখন *জীবনরঙ্গ* রিহার্সাল চলছিল, বেরিয়ে এসেছেন *উড়োচিঠি* প্রযোজনা চলাকালীন। ... *উড়োচিঠি*-তে নায়কের চরিত্রে অভিনয় করবার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত সেটা করেন শৈলেন চৌধুরী।''[৯]

এই সময় ভূমেন রায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, জীবন গাঙ্গুলী, নরেশ মিত্র প্রমুখ কয়েকজন মিলে ট্যুরিং অর্থাৎ ভ্রাম্যমান থিয়েটার তৈরি করে নাটক করে চলেছেন। শম্ভু মিত্র যোগ দিলেন সেই থিয়েটার দলে। এখানেও দু-একটি নাটকে অভিনয় করার পর শম্ভু মিত্র পুরোপুরি ভাবেই বেরিয়ে এলেন পেশাদার মঞ্চ ছেড়ে। অল্প বয়সে পেশাদার মঞ্চের একজন সচেতন দর্শক রূপে এই ধরনের থিয়েটারের নাট্য প্রযোজনা সম্পর্কে যে উচ্চধারণা শম্ভু মিত্রের মনে গড়ে উঠেছিল সেই ধারণা যে ভুল এটা তিনি এবার বুঝতে পারলেন। সমকালীন সংকট থেকে সম্পর্কহীন নাটক নির্বাচন এবং পেশাদারিত্বের অভাব শম্ভু মিত্রকে বাধ্য করেছিল পেশাদার থিয়েটার ছেড়ে বেরিয়ে আসতে। তিনি উপলব্ধি করেছেন পেশাদারী থিয়েটার তার নির্দিষ্ট কাজটাই ঠিকভাবে করতে পারছে না। একটা থিয়েটার তার সমাজের জন্য যা যা করতে পারে, করা উচিত তার কিছুই হচ্ছে না। তিনি একটা এমন থিয়েটারের অন্বেষণ করেছিলেন যা সমাজের জন্য কাজে লাগে। এই ভাবনা থেকেই তিনি পেশাদারী মঞ্চ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এক কথায় পেশাদার মঞ্চের প্রচলিত নাট্যাভিনয় তাঁকে হতাশ করেছিল। একটা অন্য ধরনের থিয়েটারের কথা তখন ভাবছেন তিনি। যদিও তাঁর কল্পিত থিয়েটারের রূপটা কি হবে সেই সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনো ধারণা তখনো গড়ে ওঠেনি। কিন্তু এটা স্থির করেছেন যে পেশাদারী মঞ্চে আর নয়। একটা অন্য কিছু করতেই হবে। এতদিনের থিয়েটার অভিজ্ঞতা এবং তাঁর পঠন পাঠনের জগত থেকে গড়ে ওঠা একটা নিজস্ব নাট্যবোধই এক ভিন্ন থিয়েটার সন্ধানে তাঁকে তাড়িত করে। এরই ফাঁকে লিখে ফেললেন সমসময়কে ধারণ করে রাখা নাটক 'উলুখাগড়া' (১৯৪২)।

শম্ভু মিত্র যখন একটা নতুন ধরনের থিয়েটার করার পরিকল্পনা করছেন তখনই যোগাযোগ ঘটে গণনাট্য সংঘের অন্যতম কর্মী তাঁর বন্ধু বিনয় ঘোষ ও বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে। সেই সূত্রেই শম্ভু মিত্র যোগদান করেন গণনাট্য সংঘ (১৯৪৩-৪৮)-এ। কীভাবে সেই সংযোগ ঘটে? শম্ভু মিত্রের কথায়—

> "... একদিন ওই বিনয় আর বিজন ভট্টাচার্য, এরা এসে বললে যে ওই অ্যান্টি ফ্যাশিস্ট রাইটার্স অ্যাণ্ড আর্টিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন হয়েছে। সেখানে ও নাটক করবে, অমুক করবে— আমি যদি যাই। তা এইসব ব্যাপারে— যদিও মোটামুটি আমি থিয়েটারেরই লোক-কিন্তু এই কোথায় কী হচ্ছে না হচ্ছে— ফ্যাসিজম্ কী, আর্ট বা এইগুলো— মোটামুটি জানা ছিল তো— মানে এসব ব্যাপারে লেখাপড়া একটু ছিল। সেজন্য এ জিনসটা আমার কাছে ঠিক মনে হল, মনে হল, হ্যাঁ যাওয়া যাক। তো সেই গেলুম, তারপর সেখানে আই.পি.টি.এ হল।"[১০]

১৯৪৩-যোগ দিলেন 'ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'-এ। আসলে শম্ভু মিত্র তখন থিয়েটারের মাধ্যমে সমসময়ের বাস্তবতাকে স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন। এখানে তিনি যুক্ত হয়ে দেখলেন বাংলা পেশাদার থিয়েটারের যে রূপ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন যে স্থবিরতা লক্ষ করেছেন তার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এই পরিবেশ। আবার সেখানে যোগ দিয়ে তিনি এমন নাটক পেলেন যার মধ্যে দিয়ে তাঁর নিজস্ব নাট্যবোধ চরিতার্থতা লাভ করতে পারে। নাটকের বিষয় বিন্যাস, নাটকের সংলাপ এবং নাট্য উপস্থাপনা সবকিছুই তাঁর অনুসন্ধানের সঙ্গে অনেকটাই মিলে যায়। বস্তুত সমকালীনতার অনুষঙ্গই তিনি খুঁজে পেলেন ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের নাটকে।

১৯৪৩ সালের ২২ মে থেকে ২৫ শে মে মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস-এ শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় অভিনীত হল বিনয় ঘোষের নাটক 'ল্যাবরেটরি'। এই সম্মেলনেই আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় আই.পি.টি.এ অর্থাৎ 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'। এতদিন পেশাদারী মঞ্চে শম্ভু মিত্র শুধুই অভিনয় করে গেছেন কিন্তু এবার অভিনয়ের পাশাপাশি অবতীর্ণ হলেন নির্দেশকের ভূমিকায়। আর প্রথম প্রচেষ্টাতেই শম্ভু মিত্র নির্দেশক হিসেবে পুরোপুরি সফল। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রথম বুলেটিনে 'ল্যাবরেটরি' নাটকের প্রয়োগ পরিকল্পনা অভিনয়ের প্রশংসা করে লেখা হয়—

> "... The technique of usuing slogans from off stage rising up into a crescendo gave the play it's dynamic quality and should be recommended to all other groups to be used whenever suitable. It creats

the illusion of a crowd and brings out, through the slogans, the pressing and urgent needs of the hour. The acting in the Bengali Play was certainly about the best in the whole show."[১১]

শম্ভু মিত্র এরপর করলেন বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী'। এটিই গণনাট্য সংঘের প্রথম প্রযোজনা। ৩রা জানুয়ারি, ১৯৪৪; স্টার থিয়েটারে শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় অভিনীত হল 'জবানবন্দী'। নির্দেশক হিসেবে শম্ভু মিত্রের এটি দ্বিতীয় নাট্যপ্রযোজনা। পেশাদারী থিয়েটারের বাইরে এক ভিন্ন অভিনয় ধারার সন্ধান তিনি বহুদিন ধরেই করছিলেন। 'ল্যাবরেটরি' নাটকের মধ্য দিয়ে এই নিরীক্ষা শুরু হয়েছিল, তাকেই এবার পূর্ণতর রূপ দিতে চাইলেন 'জবানবন্দী' নাটকে। শম্ভু মিত্রের 'জবানবন্দী' নাটকের প্রযোজনা সেদিন পূর্ববর্তী পেশাদারী থিয়েটারের ধারা থেকে সরে এসে সম্পূর্ণ নতুন একটি নাট্যধারার সূচনা করে। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে পেশাদারী নাটকাভিনয়ের সঙ্গে এই নাটকাভিনয়ের পার্থক্য এই যে, অর্থোপার্জন এর মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। নৃত্য, সঙ্গীত ও অভিনয়ের মধ্য দিয়ে গণজীবনকে রূপ দেওয়াই ছিল এর আসল লক্ষ্য।

গণনাট্য সংঘে শম্ভু মিত্রের পরবর্তী প্রযোজনা বিজন ভট্টাচর্যের 'নবান্ন' (১৯৪৪-এর ২৪ অক্টোবর শ্রীরঙ্গম মঞ্চ)। অবশ্য নাটকের মঞ্চায়নে শম্ভু মিত্রের সঙ্গে যুগ্মভাবে নাট্য পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছেন বিজন ভট্টাচার্য। এই দুই নাট্যব্যক্তিত্বের সংযোগে বাংলা থিয়েটারের জগতে তৈরি হলো এক নতুন ইতিহাস। বস্তুতঃ শম্ভু মিত্রের দ্বারা মূল নাটকের অভিনয় উপযোগী ব্যাপক সম্পাদনা, হাতে আঁকা সিনের পরিবর্তে চটের পর্দার ব্যবহার খুব সামান্যতম উপকরণ ব্যবহার করে দাতব্য চিকিৎসালয় এবং পার্কের দৃশ্যকে দর্শকের কাছে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা, চরিত্রোপযোগী পোশাক-পরিচ্ছেদে এবং দৃশ্যসজ্জায় সদ্য অতীতে ঘটে যাওয়া দুর্ভিক্ষকে জীবন্ত করে তোলা এবং সমকালীন বাস্তবতা থেকে 'ফ্যান দাও', 'ফ্যান দাও' আর্তচিৎকার কোরাসে প্রয়োগ করে এক বাস্তবসম্মত আবহ সৃষ্টিপ করা— শম্ভু মিত্রের নাট্যভাবনার এই সমস্ত প্রায়োগিক কৌশল এবং তারই সঙ্গে বিজন ভট্টাচার্যের অব্যর্থ ডায়লেক্ট উচ্চারণ ও অসামান্য অভিনয় শিক্ষার গুণে 'নবান্ন' নাট্যায়ন সেদিন এক চূড়ান্ত বিন্দু স্পর্শ করতে পেরেছিল।

'নবান্ন'-এর পর শম্ভু মিত্র করলেন রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা'। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক এই নাটক সফল প্রযোজনা হয়ে উঠতে পারেনি। একটা অন্যতম কারণ শম্ভু মিত্রের তখনও রবীন্দ্রনাটক করবার মতো বোধ বা ক্ষমতা আয়ত্ত হয়নি। আক্ষরিক অর্থেই এটি শম্ভু মিত্র নির্দেশিত প্রথম রবীন্দ্রনাটক আবার গণনাট্য সংঘ পর্বের এটিই তাঁর শেষ নাটক।

'মুক্তধারা' অভিনয়ের (মে, ১৯৪৬) অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শম্ভু মিত্র গণনাট্য সংঘ থেকে

বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু কেন এই সিদ্ধান্ত? কারণ একাধিক। গণনাট্য সংঘ ছাড়ার প্রাথমিক কারণ হলো গণনাট্য সংঘের কাজ কর্মের উপর পার্টির অহেতুক হস্তক্ষেপ যা শম্ভু মিত্রের ঠিক মনে হয়নি। শিল্পীর ওপর কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতকে তিনি স্থান দিতে চাননি। তাই বেরিয়ে এসেছিলেন গণনাট্য সংঘ থেকে। শম্ভু মিত্র গণনাট্য সংঘ এসেছেন ভালো নাটক করবেন বলে কিন্তু তিনি দেখলেন যে এখানে সেই অর্থে কোন ভালো নাটক নেই। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

> ''আমি অনেকদিন থেকেই নানান বিদেশি নাটক পড়ি এবং সেগুলো কেমন অভিনয় হয়, তার ধরনটা নিজে নিজে কল্পনা করি। তো এটা অনুভব করি, আমাদের যে অভিনয়টা হয় বা যে নাটকগুলো দেখি সেগুলোর সঙ্গে কী রকম নিজের বিস্তর ফারাক্ মনে হয়। ... মনে হয় এগুলো কী ক'রে Seriouly ভাবা যাবে, Seriouly করা যাবে— এই রকম মনে হ'ত। ... যাতে মনে হ'ত যে এইরকম যেখানে লেখক-টেখকেরা মেলে, সেখানে বোধ হয় বেশ ভাল নাটক হ'তে পারে। গিয়ে দেখলুম, কোথায়— এখানেও নাটক কিছু নেই ...।''[১২]

অর্থাৎ ভালো নাটকের অভাব শম্ভু মিত্রের গণনাট্য সংঘ ছাড়ার একটা অন্যতম কারণ বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। তেতাল্লিশের মন্বন্তর ও বামপন্থী গণপ্রতিরোধের আবহে তৈরি হওয়া গণনাট্য আন্দোলন বাংলা নাটকে যে অভিনবত্ব এনেছিল একথা অস্বীকার করা কোন উপায় নেই। কিন্তু শম্ভু মিত্র উপলব্ধি করেছেন গণনাট্য সেই অভিনব নাট্য আন্দোলন পার্টি আর সাংগঠনিক রাজনীতির মারপ্যাঁচ ক্রমশ লক্ষ থেকে চ্যুত হয়েছে। এরপর সাতচল্লিশের দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উদ্বাস্তু সমস্যা, স্বাধীন ভারতবর্ষে কমিউনিস্টপ পার্টি নিষিদ্ধ হওয়া ইত্যাদি বহু ঘটনায় শম্ভু মিত্র তখন প্রায় দিশেহারা। অথচ ভালো নাটক করার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাঁকে প্রতিনিয়ত তাড়িত করছে। তবে তিনি এটাও জানেন একদিনে ভালো নাটক তৈরি করা যাবে না। কিন্তু শুরু করতে হবে। তিনি লিখেছেন—

> ''... সর্বগুণ সমন্বিত ও সর্বজনপ্রিয় নাটক আমাদের দেশে এক্ষুনি হঠাৎ হতে পারে না। আজকের কাজ হচ্ছে চেষ্টার, আপ্রাণ অনুশীলনের এবং সেই অনুশীলনের উৎসাহদাতা সমালোচক হতে পারেন একমাত্র সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিরা।''[১৩]

এই ভাবনা থেকেই ১৯৪৮-এর শেষার্ধে শুরু হল নতুন নাট্যদলের নতুন প্রযোজনার প্রচেষ্টা। শম্ভু মিত্র সঙ্গে পেলেন তিন সহকর্মীকে: অশোক মজুমদার, অমর গাঙ্গুলী, ও মহম্মদ জাকেরিয়া। আর পেয়েছেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যকে। তৈরি হল নাট্যদল। নাম রাখলেন 'অশোক মজুমদার ও সম্প্রদায়'

কিছুদিন পরে মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের কথামতো দলের নামকরণ হল 'বহুরূপী' (১৯৫০)। বহুরূপী নাট্য দলের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে শম্ভু মিত্র বলেছেন— ''ঐ ভালো ক'রে করতে হবে আমাদের। ... ভালো নাটক করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।''[১৪] অর্থাৎ তিনি ভালো নাটক ভালোভাবে করতে চেয়েছেন। বলাবাহুল্য এধরনের একটা নাট্যদল গড়ে তোলার ভাবনা বাংলা তথা ভারতবর্ষের থিয়েটারের ইতিহাস একেবারেই অভিনব। একটা অপেশাদার গ্রুপ থিয়েটার দলের এই ধারণা বাংলাসহ ভারতীয় থিয়েটারে ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। এখানে উল্লেখ্য প্রথম পর্বের পেশাদারী থিয়েটার ছিল অনেকটা কোম্পানিসুলভ ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। পরবর্তী পর্বে শিশিরকুমার মতো কিছু নাট্য ব্যক্তিত্বের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তা লিমিটেড কোম্পানি। আর শম্ভু মিত্র বহুরূপীর মাধ্যমে সূচনা করলেন সমিতিভুক্ত দল অর্থাৎ গ্রুপ থিয়েটার। এখানে কেউ মালিক নন একটা গণতান্ত্রিক সংগঠন। শম্ভু মিত্রের বহুরূপী-র এই দেখানো পথেই পরবর্তীকালে বাংলার গ্রুপ থিয়েটারগুলি গঠনতন্ত্র নির্মিত হয়।

বহুরূপী পর্বে (১৯৪৮-৮০) শম্ভু মিত্রের প্রথম প্রযোজনা বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন'। ১৯৪৮ সালের ১৩,১৪ ও ১৬ সেপ্টেম্বর রঙমহল-মঞ্চে এই নাটকের অভিনয় হয়। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ে করেছেন বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, কালী সরকার, ঋত্বিক ঘটক, তৃপ্তি মিত্র প্রমুখ। বহুরূপী তথা শম্ভু মিত্রের প্রথম থেকেই লক্ষ্য ছিল পেশাদারী মঞ্চের গতানুগতিক ধারা থেকে থিয়েটারকে মুক্ত করা। 'নবান্ন' সেই ভাবনার প্রথম পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা। এ সম্পর্কে শম্ভু মিত্র বলেন:

> ''যদি নতুন করে কিছু করতে হয় তাহলে দলের চেহারা এবং ভিত্তি প্রচলিত পেশাদারী পদ্ধতি অনুসরণ করে করলে করা যাবে না। কারণ তাহলে অর্থপ্রাপ্তির আকঙ্ক্ষায় দর্শকের পছন্দমাফিক নাটকই করতে হবে, তারা যে পদ্ধতি দেখে অভ্যস্ত সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে বড়জোর আলগা চটক হিসেবে এখানে সেখানে চমক সৃষ্টির চেষ্টা করা যেতে পারে। তাতে কোনোদিনই ভালো নাটক ভালোভাবে করা যাবে না।''[১৫]

বহুরূপীর পরবর্তী প্রযোজনা তুলসী লাহিড়ীর 'পথিক'। ১৯৪৯-এর ১৬ অক্টোবর, রেলওয়ে ম্যানসন ইনস্টিটিউট বর্তমানে নেতাজি মঞ্চ-এ শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় অভিনীতি হল 'পথিক'। বাংলা বিহার সীমান্তে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারের একটি চায়ের দোকানকে নিয়ে এই তিন অঙ্কের নাটকের একমাত্র দৃশ্যপটপ তৈরি হয়। জানা যায় 'নবান্ন' নাটকের মত 'পথিক' নাটকেও স্টেজের তিনদিক চটের পর্দা দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছিল। দরজা-জানালাগুলো তারই গায়ে কাটা ছিল। এভাবে চট দিয়ে

ঘেরা মঞ্চে ঘরের ছাউনি দিয়ে তৈরি হয়েছিল কয়লাখনি অঞ্চলের পরিচিত দোকানঘর। বাস্তব পরিস্থিতি ফুটিয়ে তুলতে সেই চায়ের দোকানে লাগানো হয়েছিল চা কোম্পানির পোস্টার। এই সবকিছুই করা হয়েছিল সময়ের দাবি মেনে।

'পথিক' করার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শম্ভু মিত্র পর পর করলেন 'উলুখাগড়া' (১২ আগস্ট, ১৯৫০), 'ছেঁড়া তার' (১৭ ডিসেম্বর, ১৯৫০) ও 'বিভাব' (২৯ এপ্রিল, ১৯৫১)। প্রথম নাটকটি শ্রী সঞ্জীব ছদ্মনামে লিখেছেন শম্ভু মিত্র, দ্বিতীয় টি তুলসী লাহিড়ী এবং তৃতীয় নাটকটি লিখেছেন বহুরূপীর কয়েকজন সদস্য মিলে। তিনটি নাটকেরই নির্দেশনায় ছিলেন শম্ভু মিত্র। প্রতিটি নাটকই ভাবনার বিশিষ্টতায়, মঞ্চসজ্জার আধুনিকতায়, অভিনয় দক্ষতায় বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল।

'নবান্ন' (১৯৪৮) থেকে 'বিভাব' (১৯৫১)-এই পর্যন্ত বহুরূপী-র নাট্যপ্রযোজনাগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল সমকালীন সময়ের নানা ঘাত— প্রতিঘাত। গণনাট্য সংঘ ছেড়ে এলেও শম্ভু মিত্র নাটক নির্বাচনে সময়ের প্রতি, সমাজের প্রতি, তাঁর দায়বদ্ধতা থেকে কখনো সরে যাননি। দারিদ্র্য-ক্ষুধা, সাম্প্রদায়িক বিভাজন থেকে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত— বহুরূপী তথা শম্ভু মিত্রের নাট্যচিন্তার বৃত্তটি তখন এমনই নানান সামাজিক অভিঘাতের মধ্যে থেকে পথ খোঁজার চেষ্টা করছে। কিন্তু এর পরেই শম্ভু মিত্র ও তাঁর বহুরূপী থিয়েটার গ্রুপের অভিমুখ বদলে যায়। এতদিন যে থিয়েটারের ঐতিহ্যের মধ্যে নিজের নাট্যচর্চা অব্যাহত রেখেছেন সেই থিয়েটার সম্পর্কেই এবার তিনি প্রশ্ন তুলেন। ১৯৫১-এ লেখা 'বাংলা থিয়েটার' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—

> ''স্বাধীনতার পরেও আমরা আর কতদিন বিলেতি বা 'বিদেশি চাকচিক্যের সামনে' এভাবে নপুংসক আত্ম-অবমাননায় মগ্ন থাকব?''[১৬]

এই বলে তিনি বিলিতি থিয়েটারের অন্ধ অনুকরণের পরিবর্তে দেশীয় লোকনাট্য-যাত্রাকে অনুসরণের কথা বলেন। এটা তো ঠিক উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক শাসনের হাত ধরেই এদেশে আমদানি হয় 'বিলিতি যাত্রা'র। আর ব্রাত্য থেকে যায় আমাদের দেশীয় লোকনাটক ও যাত্রা। ক্রমশ আমরা ভুলেই গেছি আমাদের নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি। শম্ভু মিত্রের মতে সেই ঔপনিবেশিক থিয়েটার খুব স্বাভাবিক কারণেই পথভ্রষ্ট হয়েছে। তাই পথ খুঁজে পেতে আমাদের ফিরতে হবে যাত্রার পথে। তবে পুরোনো যাত্রার পথে নয়, নতুন করে তাকে খুঁজে পেতে হবে। শম্ভু মিত্রের ভাষায়:

> ''হয়তো যাত্রারই পথে। কিন্তু পুরোনো যাত্রার পথে নয়। নতুন করে খুঁজে পেতে হবে তাকে। আমাদেরও অনেকের চেষ্টা সেই পথে। এমন একটা নাট্যশিল্প খুঁজে পেতে চাই যা একান্তভাবে বাঙালির। ... আমাদের বাংলার ছবি, বাংলার নাচ, বাংলার কাব্য যেন প্রাণ দেয় সেই নাট্যের। বাংলার নিগূঢ়

প্রাণ যেন প্রকাশ পায় তাতে। সেই হবে আমাদের 'যাত্রা', আমাদের বাঙালি থিয়েটার।"[১৭]

শম্ভু মিত্র সেই নাট্যাদর্শের সন্ধানে আশ্রয় নিলেন রবীন্দ্রনাথে। কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন রবীন্দ্রনাথের রুচিবোধ তাঁর নাটকের ফর্মকে এত কঠোর করেছে যে তা সাধারণ দর্শকের মনকে ছুঁতে পারেনি, সাধারণ রঙ্গালয়ও তাঁকে বুঝতে পারিনি। তদানীন্তন সাধারণ রঙ্গালয় ও তাঁকে মেলাবার দায়িত্ব আছে বর্তমানে। বলাবাহুল্য এই মেলাবার কঠিন দায়িত্বই নিয়েছিলেন শম্ভু মিত্র ও তাঁর বহুরূপী থিয়েটার গ্রুপ। রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয় করে দেশজ থিয়েটারের মধ্যেই শম্ভু মিত্র একটা নতুন নাট্যাদর্শের সন্ধান শুরু করলেন এই পর্বে। তাঁর এই নবলব্ধ নাট্যচিন্তনের প্রথম সাক্ষ্য পাওয়া যায় ২১ আগস্ট, ১৯৫১ শ্রীরঙ্গম মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' প্রযোজনার মধ্যে। 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের নাট্য রূপায়নে শম্ভু মিত্র অসামান্য মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। অসামান্য বুদ্ধিদীপ্ত অভিনয়, সংলাপের উচ্চারণ, মঞ্চসজ্জা, আবহন নির্মাণ— সব মিলিয়ে আধুনিক এক নাট্যভাষা নির্মিত হয়েছিল এই প্রযোজনায়। শম্ভু মিত্র যেন নাট্যের এক অযুত সম্ভাবনার জগৎ এবার খুঁজে পেলেন রবীন্দ্রনাথে।

বহুরূপী-র পরবর্তী প্রযোজনা 'রক্তকরবী'। প্রথম অভিনয় করে ১৯৫৪-এর ১০ মে রেলওয়ে ম্যানসন ইনস্টিটিউট, বর্তমান নেতাজি ভবন-এ। শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায়, 'রক্তকরবী'-র এই প্রযোজনা বাংলা নাট্যের ইতিহাসে এক মাইল ফলক। রবীন্দ্রনাথের নাটককে ইউরোপীয় অথবা সংস্কৃত কোন নাট্য-ব্যাকরণের লক্ষণ মেলানো যায় না। কিন্তু সাধারণ থেকে প্রতীক, মাটি থেকে আকাশ, স্থূল থেকে সূক্ষ্ম যে প্রসারতা আমাদের দেশজ শিল্পচিন্তার ভেতর আছে, তারই সেরা উত্তরাধিকার রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'। শম্ভু মিত্র 'রক্তকরবী'-র দেশজ আঙ্গিকটি ধরতে পেরেছিলেন। এবং সেই অনুযায়ী তিনি 'রক্তকরবী'-র মঞ্চায়ন করেছেন। গগনেন্দ্রনাথের ত্রিকৌণিক ছবির আদলে 'রাজার জাল', ওপরে শ্যেনচক্ষুর লাল নিষেধ, চারদিকে কমররাজার দাঁতের ইঙ্গিত, এই প্রযোজনার মধ্যে উদ্ভাসিত খালেদ চৌধুরী ঘরবাড়ি, যন্ত্রের বিচিত্র লঘুগম্ভীর, কর্কশ, ক্লান্তিকর শব্দসমাহারের সঙ্গে নাকাড়া বাঁশি ও বেহালার সুর দর্শকদের উদ্বেল করে। সন্ধ্যা দে লিখেছেন,

"এখানে পরিচালক শম্ভু মিত্র যা করতে চেয়েছেন তা অনুকরণ নয়, রবীন্দ্রনাথের নকল নয়, রবীন্দ্রানুগ প্রেরণায় নতুন সৃষ্টি।"[১৮]

এককথায় বলা যায়, বহুরূপী প্রযোজিত 'রক্তকরবী' সমস্ত প্রথাবদ্ধতা ও গতানুগতিকতাকে ভেঙে দিয়ে রবীন্দ্রনাট্য নিয়ে সৃজনশীল নিরীক্ষার অমিত সম্ভাবনার দরজা খুলে দেয়। শম্ভু মিত্রের 'রক্তকরবী' নাট্য প্রযোজনা সম্পর্কে উৎপল দত্তের মূল্যায়ন এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য—

> ''বহুরূপী বাংলা মঞ্চের প্রকৃত ঐতিহ্যটিকে ধরেছেন। ... কোথায় যেন বহুরূপী খাঁটি বাংলা নাট্যরূপটা ধরেছেন— বাচিক অভিনয়ে বিশেষ ক'রে। পুরো নাটকের কথোপকথন, যেন একটা সঙ্গীতের উত্থান-পতনের মতন কানে আছড়ে পড়তে থাকে, তার মধ্যে শম্ভুবাবুর নিজের উদাত্ত কণ্ঠস্বর যেন শুদ্ধপর্দায় কতকগুলি চমকপ্রদ তান দিয়ে বৈচিত্র্য আনত, গান জমিয়ে দেয়া কঠিন চরিত্র সৃষ্টির মধ্যেও এই সুরের আর গদ্যছন্দের খেলায় বহুরূপী অপ্রতিদ্বন্দ্বী; এখানেই বিশেষ ক'রে তাঁরা খাঁটি বাঙালি। অন্যপক্ষে য়ুরোপীয় মঞ্চের প্রোসিডিয়ামের অভ্যন্তরে ইন্দ্রজাল সৃষ্টির অপূর্ব কলাকৌশলও বহুল পরিমাণে এনে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন শম্ভু মিত্র।''[১৯]

শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় বহুরূপীর পরবর্তী প্রযোজনা 'পুতুল খেলা'। ১০ই জানুয়ারি, ১৯৫৮ মহাজাতি সদনে নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়। মূল নাটক ইবসেন-এর 'এ ডলস্ হাউস'। নাট্য রূপান্তর করেন শম্ভু মিত্র। মঞ্চ সজ্জা ও আলোক সম্পাতের দায়িত্বে ছিলেন খালেদ চৌধুরী ও তাপস সেন। একটিমাত্র দৃশ্য, প্রধানত কেবল দুটি চরিত্র, রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ কবিতার ব্যবহার, উদ্বেগ মুখর মুহূর্ত গড়ে তোলার তীব্র নাটকীয়তা, মানসিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আলোর সুষম বিন্যাস এবং সর্বোপরি বাংলা নাটক নতুন প্রগতিশীল বোধের সঞ্চার সব মিলিয়ে 'পুতুল খেলা' অসাধারণ মঞ্চসফল নাটক।

ইবসেন-এর পর শম্ভু মিত্র আবার ফিরে এলেন রবীন্দ্রনাথে। ১৯৫৯-এর ১৫ ডিসেম্বর নিউ এম্পায়ার-এ শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হলো 'মুক্তধারা' নাটক। যদিও এই নাটকের মহলা অনেক আগের থেকেই শুরু হয়েছিল, কিন্তু বিশ্বভারতীর নতুন বিধি-নিষেধের কারণে অনেকটা সময় চলে যায়। এই নাটকে অভিনয় করেছিলেন শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, গঙ্গাপদ বসু, অমর গাঙ্গুলী, দেবতোষ ঘোষ, কুমার রায় প্রমুখ। আমরা জানি গণনাট্য সংঘ পর্বে শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় 'মুক্তধারা' অভিনীত হয়েছিল। কিন্তু নির্দেশক জানিয়েছেন গতবারের মতো এবারও 'মুক্তধারা' নাট্যাভিনয় ব্যর্থ হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে শম্ভু মিত্রের স্বীকারোক্তি,

> '' 'চার অধ্যায়' ও 'রক্তকরবী' অভিনয়ের পরে যখন মনে হল যে রবীন্দ্রনাটকের হিসেব আমরা বুঝে গিয়েছি, তখনই মুক্তধারা করতে গিয়ে প্রচণ্ডভাবে ব্যর্থ হলাম। বুঝলাম রবীন্দ্রনাথ অতো সোজা নয়, অত সহজে তাঁকে বুঝে ফেলা যায় না।''[২০]

দ্বিতীয়বার 'মুক্তধারা' নাট্য প্রযোজনায় ব্যর্থ হলেও তিনি হাল ছাড়েননি। আবার করলেন রবীন্দ্রনাথের

'বিসর্জন' নাটক। নাটকটি অভিনীত হয় ১৯৬১-র ১১ নভেম্বর, দিল্লির আইফ্যাক্স হল-এ কিন্তু এবারও দর্শকের মন জয় করতে তিনি ব্যর্থ হলেন। এরপর বহুরূপী-র জন্য শম্ভু মিত্র বেছে নেন 'অন্ধকারের নাটক' শিরোনামে সোফোক্লিসের 'রাজা অয়দিপাউস' এবং রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটক। মূলত ষাট-সত্তরের দশকের উত্তাল সময়কে তিনি এইসব নাট্যায়নের মাধ্যমে তুলে ধরতে চেয়েছেন। যেখানে অন্ধকারের করাল গ্রাসে জীবন আচ্ছন্ন, পারস্পরিক সন্দেহ-অবিশ্বাসের এক ভয়ঙ্কর পরিবেশে জীবনের আদর্শ মুখ থুবড়ে পড়ে, সেই সময়কে তিনি তুলে ধরার জন্য 'অন্ধকারের নাটক' হিসেবে এই দুটি নাটকের পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন।

'রাজা অয়দিপাউস' অভিনীত হয় ১৯৬৪-র ১২ জুন, নিউ এম্পায়ার-এ। সোফোক্লিসের নাটকের হুবহু অনুসরণ না করে শম্ভু মিত্র আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসার প্রেক্ষাপটে নাটকটির নবনির্মাণ করেন। এক্ষেত্রে শম্ভু মিত্র অনেকটাই অনুসরণ করেছেন ইয়েটসকে। এই নাটকটির আবেদন চিরকালীন এবং আন্তর্জাতিক। গ্রিক মহাকাব্যে এবং ট্রাজেডিতে যে অভাবনীয় ভয়ঙ্কর এবং অন্ধকারের সামনে নায়কদের দাঁড়াতে হয়, সেখানে তাঁদের হেলেনীয় পতনের মধ্যেও বড় হয়ে উঠে এক আশ্চর্য সংগ্রামী পৌরুষ। ইয়েটসের পথে ধরেই শম্ভু মিত্র চেষ্টা করেছেন সেই রাজা অয়দিপাউসকে আঁকতে, যিনি ধ্বংস জেনেও আত্ম আবিষ্কারের নিষ্ঠুর সত্যকে মর্যাদার সঙ্গে বহন করেন। শম্ভু মিত্র নাটকটির সত্যধর্ম রক্ষায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবিচলিত থেকেছেন। এই নাটকে অভিনয় করেছেন শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, অমর গাঙ্গুলী, গঙ্গাপদ বসু, পান্না মুখার্জী, কালীপ্রসাদ ঘোষ। মঞ্চসজ্জায় ছিলেন অনিল ব্যানার্জি আর আলোকসম্পাতে ছিলেন তাপস সেন, রমাপদ চট্টোপাধ্যায় ও প্রদীপ চক্রবর্তী। সব মিলিয়ে 'রাজা অয়দিপাউস' বহুরূপীর সার্থক প্রয়াস।

শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় বহুরূপীর পরবর্তী প্রযোজনা রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটক। প্রথম অভিনয় হয় ডি এম্পায়ার-এ ১৯৬৪-র ১৩ জুন। এই নাটকে রাজার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শম্ভু মিত্র। রাণীর ভূমিকায় তৃপ্তি মিত্র। এছাড়া বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন কুমার রায়, অমর গাঙ্গুলী, অরুণ মুখার্জী, কালীপ্রসাদ ঘোষ, গঙ্গাপদ বসু প্রমুখ। নাটকটির প্রয়োগের ক্ষেত্রে শম্ভু মিত্র ভীষণভাবে সফল। এ প্রসঙ্গে সন্ধ্যা দে'র মূল্যায়ন আমরা উল্লেখ করে বলতে পারি—

> ''... সবচেয়ে কৃতিত্ব, 'রাজা'-র আপাত অনড় ঘটনাবলীকে সচ্চল ছন্দে মঞ্চের ওপর জাগিয়ে রাখা। এই ছন্দ ফুটে উঠেছে চরিত্রগুলির কম্পোজিশনে, তাদের শারীরিক মুদ্রায়, তাদের স্বরের উত্থাপতনে এবং পারস্পরিকতায়। রাণীর সুদর্শনার অন্ধকার ঘর, নেপথ্য থেকে রাজার বাণী, রাজপথে পরবাসীর উৎসব যাত্রা এবং শেষ দৃশ্যে রাণীর বদ্ধজীবনের অবসানের দৃশ্য ব্যঞ্জনা দর্শকদের

কাছে স্মরণীয়।”[২১]

শম্ভু মিত্রের নাট্য জীবনের স্মরণীয় সৃষ্টি তাঁর ‘চাঁদ বণিকের পালা’ নাটক। ‘রাজা অয়দিপাউস’ এবং ‘রাজা’ নাটকের মঞ্চায়নের সমকালেই এই নাটকের পরিকল্পনা। একটি সাক্ষাৎকারে এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

> ‘‘... আমার মনে আছে যখন আমি ‘অয়দিপাউস’ আর ‘রাজা’ রিহার্সাল দিচ্ছি, সেই মহলার সময়ই মনে হয়েছিল যে এইটাতে তো বেশ একটা সোজা ক’রে সেট্ ক’রে— একটা প্ল্যাটফর্মে ‘রাজা’ হ’য়ে যাচ্ছে। তা আমার মনে হয়েছিল যে এইটাই কিন্তু আরও কায়দা ক’রে ব্যবহার করা যায়। এই কী ক’রে করা যায় করতে (করতে)— এই সব ভাবতে-ভাবতে কেমন ক’রে জানি না এই চাঁদ সদাগরের কাহিনিটা মাথায় এসেছিল এবং মনে হয়েছিল যে এইটা আমাদের এখনকার সঙ্গে-আধুনিক কালের সঙ্গে ভয়ানক ভাল মেশে। এইটা করা যায়।”[২২]

যদিও এই নাটক শম্ভু মিত্র মঞ্চায়ন করেননি। কিন্তু নাটক হিসেবে ‘চাঁদ বণিকের পালা’ অপূর্ব সৃষ্টি। মঙ্গলকাব্যের কাঠামোর মধ্যেই আধুনিক এক যন্ত্রণাবিদ্ধ মানুষের ‘পাড়ি’ দেবার সংগ্রামকে তুলে ধরেছেন নাট্যকার।

শম্ভু মিত্রের ‘বহুরূপী’র এই পর্বের নাট্যকর্মের বৃত্তটি মূলত রবীন্দ্রনাথ, ইবসেন, সোফোক্লিলের মতো ধ্রুপদী নাট্যের মধ্যে আবর্তিত। কিন্তু ষাটের দশকের মাঝামাঝি সেই সময়টায় পশ্চিমবঙ্গসহ গোটা দেশ ও জাতি যখন স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় কাতর, তখন সেই বিপর্যস্ত সমকালকে স্পর্শ করতে চেয়ে তিনি ফিরে এলেন একেবারে সমকালীন নাট্যকারদের নাটকে। যেন নিজেরই তৈরি করা ধ্রুপদী প্রযোজনার আদর্শকে নিজেই ভেঙ্গে তছনছ করেছেন তিনি। অসংখ্য প্রশ্ন আর দ্বিধা-সংশয়, অবিশ্বাসের সংঘাত, ইতিহাসের ধারাবাহিকতা থেকে সমকালকে বিচ্ছিন্ন হতে দেখার যন্ত্রণা যেন বেরিয়ে আসে তাঁর এই সময়ের নাট্যপ্রযোজনা থেকে। বেছে নিয়েছেন নীতিশ সেনের ‘বর্বর বাঁশি’ মারাঠি নাট্যকার বিজয় তেণ্ডুলকরের নাটক ‘শান্ততা কোর্ট চালু আহে’-র বাংলা ভাষান্তর ‘চোপ আদালত চলছে’ এবং সর্বোপরি বাদল সরকারের ‘বাকি ইতিহাস’, ‘পাগলা ঘোড়া’-র মতো নাটক।

শম্ভু মিত্র একটি সাক্ষাৎকারে নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন— ‘‘আমি একেবারে— আদ্যোপান্ত ‘নোটো’ লোক যাকে বলে।”[২৩] নাটক নিয়ে, নাটকের প্রয়োগের কলাকৌশল নিয়ে তিনি সারাজীবন নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা গেছেন। বাংলা থিয়েটারে নির্মাণ করেছেন থিয়েটারের একটি স্বতন্ত্র ধারা।

শম্ভু মিত্র থিয়েটারের নামে সস্তা জনপ্রিয়তায় বিশ্বাস করতেন না। এজন্য শম্ভু মিত্র অবশ্য দর্শক-শ্রোতার শিল্প সম্ভোগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি মনে করেন দর্শক যদি তাদের সামজিক হৃদয়বৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা না করে, সস্তা হাততালির বিনোদন যদি তাদের গ্রাস করে তাহলে থিয়েটার কখনো উনত হতে পারে না। অর্থাৎ দর্শকের শিল্পেবোধের বিষয়টি শম্ভু মিত্রের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন, দরকার সুবিবেচিত গুণবিচার— ''পিঠ চাপড়ানো নয়, নবাবি নয়, খালি সত্যকার গুণটাকে গুণ ব'লে বোঝা।''[২৪]

শম্ভু মিত্র থিয়েটারের মঞ্চব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন কথা বার বার বলেছেন। বাংলা থিয়েটারের প্রথম পর্ব থেকেই আমরা লক্ষ্য করি দর্শককে ভোলানোর জন্য নানা রকম কৌশল অবলম্বন করা হয়। বাস্তবতার খাতিরে মঞ্চে গোটা একটা গাছ তুলে আনার ঘটনাও একসময় ঘটেছে। থিয়েটারের ইতিহাসে জানা যায় স্বয়ং অমরেন্দ্র দত্ত নাকি মঞ্চে ঘোড়ায় চড়ে উপস্থিত হতেন। বেশিরভাগ দর্শক ওই চাকচিক্যেই ভোলেন এবং সস্তা-আবেগের স্টান্টবাজি অভিনয়ে মুগ্ধ হন। শম্ভু মিত্র এই ধরনের মঞ্চ ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন না। অবশ্য তিনি নিজেও একসময় মঞ্চব্যবস্থার এই প্রথাগত ঐতিহ্যকেই স্বীকার করেই তাঁর নাট্যপ্রযোজনাগুলি করে গেছেন, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাঁর চিন্তাভাবনার পরিবর্তন ঘটে। পাশ্চাত্য থিয়েটারের অন্ধ অনুকরণ থেকে বেরিয়ে এসে তাকে তিনি আমাদের দেশের ঐতিহ্যের অনুসারী করে গড়ে তোলার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন,

> ''আমাদের দেশের নাট্যাভিনয় আমাদেরই মতো হওয়া চাই। বিদেশীর চতুর্থ শ্রেণীর অনুকরণ যেন না-হয়।''[২৫]

বাংলা থিয়েটারে 'নবনাট্য'-নামক একটি নতুন শব্দবন্ধের আমদানি করেন শম্ভু মিত্র। ১৯৫১-তে লেখা 'আন্দোলনের প্রয়োজন' প্রবন্ধে তিনি সর্বপ্রথম 'নবনাট্য' শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেন এবং একটি বৃহত্তর নাট্য আন্দোলনের গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। নবনাট্য আন্দোলন সম্পর্কে শম্ভু মিত্রের বক্তব্য খুব স্পষ্ট। তিনি বলেছেন—

> ''...নবনাট্য মানে সেই নাট্য যেটা জীবন সম্পর্কে আমাদের গভীরতার বোধ এনে দেবে, সমাজের জটিল স্তরবিন্যাস সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধির সহায়ক হবে, যেটা আমাদের বুদ্ধি ও হৃদয়কে একসঙ্গে বেঁধে মহৎভাবে বাঁচবার অনুপ্রেরণা দেবে।''[২৬]

অর্থাৎ আদর্শগত দিক থেকে নবনাট্য হলো 'ব্যক্তিগত মানুষ' আর 'সমাজগত মানুষ'কে মঞ্চের পরিসরে মেলানোর একটি বিকল্প নাট্য। শম্ভু মিত্র উপলব্ধি করেছেন নাট্যমঞ্চে পাল্টে যাওয়া চরিত্রকে

সমাজের সঙ্গে, ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়াটা জরুরি। আর সে কারণেই তিনি এই ধরনের নাট্য আন্দোলনের কথা বলেছেন। শুধু আদর্শগত দিক থেকে নয়, মঞ্চায়নের দিক থেকেও তাঁর নবনাট্য ধারণা অভিনব। তিনি বলেছেন, ''য়ুরোপের naturalistic মঞ্চসজ্জার সবচেয়ে অক্ষম অনুকরণ আমাদের ব্যবসায়িক রঙ্গমঞ্চ। এবং সেইগুলো দেখতে দেখতেই আমাদের দর্শকরা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। আজ তাই দরকার হয়েছে নতুন ক'রে মঞ্চসজ্জা করবার। যে-মঞ্চসজ্জায় বাহুল্য থাকবে না, কিন্তু গভীরতা থাকবে।''[২৭] সেই সঙ্গে তিনি এও বলেছেন মঞ্চ সজ্জা বাহুল্য থাকবে না, তার মানে এই নয় যে পুরোনো যাত্রায় ফিরে যাওয়া, আসলে তাকে নতুন করে তুলে ধরা।

শম্ভু মিত্র তাঁর নাট্যায়নের মধ্যে এই নবনাট্যের ধারণাকেই মান্যতা দিয়েছেন। এটা ঠিক শম্ভু মিত্র যে নবনাট্য আন্দোলনের জন্য প্রাণাতিপাত করেছেন সারাজীবন, তা কিন্তু বেশিদিন দীর্ঘস্থায়ী হলো না। কিছু দিনের মধ্যেই সেই আন্দোলন পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। নবনাট্যের নামে শুরু হয় যথেচ্ছাচার—

> ''... *নবান্ন*-এ আরম্ভ যার *রক্তকরবী*-তে তা হয়েছে সমাপ্তি। ... অথচ এখন দেখি অলিতে গলিতে নব-নাট্য আন্দোলন বলে অজস্র ব্যাঙের ছাতা গজিয়ে উঠেছে। এরা কারা? এরা আমাদের বাঙালি জাতির সেই অনাদ্যন্ত দ্বিতীয় ধারাটি— যেটি হল সংখ্যাগুরু প্রিয়...।''[২৮]

শম্ভু মিত্র এই সময়ে এক ধরনের আত্মপ্রশ্নে, আত্মবীক্ষায় জর্জর। কোন পথে বাংলা থিয়েটারের উত্তরণের সম্ভব হবে? এবার শম্ভ মিত্রের নাট্যভাবনায় এলো ভারতীয় বা জাতীয় নাট্যাদর্শ। নবনাট্য থেকে তিনি শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যান ভারতীয় থিয়েটারের তত্ত্বে। শম্ভু মিত্র মনে করেন ইউরোপীয় নাট্যাদর্শের সঙ্গে ভারতীয় নাট্যদর্শের মূল পার্থক্য জীবন দর্শনে। ইউরোপীয় নাট্যের মূল ভিত্তি সংঘাত। সেখানে ভারতীয় নাট্যাদর্শের মূল নিহিত রয়েছে তার সুগভীর জীবনবোধ। সেই জীবনবোধের প্রকাশের পদ্ধতি কখনোই ইউরোপের রিয়ালিস্টিক মঞ্চরূপ নয়, বরং বাস্তববাদী নাটকের ফর্মকে ভেঙেই তবে ওই সুগভীর সত্যপ্রকাশ করা সম্ভব। এই পথেই আসবে বাংলা থিয়েটারের আসল মুক্তি। আর সেই সঙ্গে তিনি এটাও বিশ্বাস করেন বাংলা নাট্যের ভবিষ্যতে পৌঁছতে গেলে রবীন্দ্রনাথকে ছুঁয়েই তবে যেতে হবে। তাঁকে এড়িয়ে গেলে হবে না। কেননা রবীন্দরনাথেই আছে সেই কাঙ্খিত ভারতীয় নাট্যধরণ, আমাদের নিজস্ব জীবন দর্শন।

শম্ভু মিত্র মনে করেন অভিনয় হলো 'আবেগের কাব্য'। অভিনয় শেষপর্যন্ত একটা 'ভালোবাসার কাব্য' হয়ে ওঠে, যা ব্যক্তি মানুষের বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনকে একই উপলব্ধিতে লীন করে দেয়। যেখানে শেষ পর্যন্ত থাকে না কোনো নাটকীয় টেনশন। সেই নাট্যাভিনয়ের ফর্ম

আমাদের জাতীয় জীবনেই আছে। এক্ষেত্রে শম্ভু মিত্র আমাদের দৃষ্টি দিতে বলেছেন যাত্রার দিকে। তবে পুরোনো থিয়েট্রিক্যাল যাত্রার মধ্যে এই কাঙ্ক্ষিত 'কাব্য' পাওয়া সম্ভব নয় অথচ সেটা পাওয়া যাবে যাত্রার অনুভব থেকেই। আর সে-কারণেই তিনি মনে করেন রবীন্দ্রনাথ একমাত্র সেই নাট্যকার, যাকে অবলম্বন করে পৌঁছোনো যাবে সেই কাঙ্ক্ষিত ভারতীয়ত্বে। আসলে তিনি উপলব্ধি করেছেন বাংলা থিয়েটার আর যাই হোক সেটা আমাদের মাটিজাত নয়। তার সঙ্গে আমাদের কৃষ্টি-কালচার মন ও মননের কোন যোগ নেই। সুতরাং ভারতীয় থিয়েটার বলে যদি কিছু থাকে আমাদের লোকজসংস্কৃতির গভীরেই তার সন্ধান করা উচিত। শম্ভু মিত্র তাঁর নাট্যপ্রযোজনাগুলির মধ্যে,বিশেষ করে বহুরূপী পর্বের নাট্য প্রযোজনা মধ্যে সেই ভারতীয় থিয়েটারেরই অন্বেষণ করার চেষ্টা করেছেন। এখানেই শম্ভু মিত্রের নাট্য ভাবনা স্বতন্ত্র।

শম্ভু মিত্রের সমকালেই বাংলা থিয়েটারে আবির্ভাব ঘটে উৎপল দত্তের (জন্ম: ২৯ মার্চ ১৯২৯, মৃত্যু : ১৯ আগস্ট,১৯৯৩)। উৎপল দত্তের থিয়েটার জীবনের হাতেখড়ি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পঠনকালে। অভিনেতা রূপে বাংলা থিয়েটারে উৎপলদত্তের আবির্ভাব ১৯৪৩ সালে। সে বছর সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল এবং সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের যৌথ উদ্যোগে সাঁ সুসি প্লেয়ার্সর-এর প্রযোজনায় ফাদার উইভার-এর পরিচালনায় 'হ্যামলেট' নাটকে ছোট্ট একটি চরিত্রে অভিনয় দিয়ে উৎপল দত্তের থিয়েটারে প্রবেশ। তারপর কয়েকজন সহপাঠী মিলে ১৯৪৭-এ প্রতিষ্ঠা করলেন 'দ্য অ্যামেচার শেকসপীরিয়ানস্' নাট্যদল। ১৫ই অগাস্ট,১৯৪৭ রঙ্গমঞ্চে তাঁরা প্রযোজনা করে শেক্সপিয়রের 'রিচার্ড দ্য থার্ড' নাটক। এই নাটকের অভিনয় সূত্রেই উৎপল দত্তের সঙ্গে পরিচয় ঘটে বিখ্যাত শেকসপীয়ারিয়ান ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানির নাট্য পরিচালক জেফ্রি কেনডালের সঙ্গে। আর তাই, ''কোন ভারতীয় বা বাঙালি ঐতিহ্যে নয়, উৎপল দত্ত শুরু থেকেই লালিত হলেন য়ুরোপিয় প্রয়োগ ঘরানায়।''[২৯] এই জেফ্রি কেনডালের কাছ থেকে উৎপল দত্ত তাঁর থিয়েটারের প্রাথমিক শিক্ষা নিয়েছেন। উৎপল দত্ত লিখেছেন, ''এটুকু বললেই হবে, যা শিখেছিলাম তাই এনে প্রয়োগ করেছিলাম লিটল থিয়েটার গ্রুপে।''[৩০] কেনডালের নাট্যদল 'শেক্সপিয়রিয়ানা ইন্টারন্যাশনাল'-এ উৎপল দত্ত বেশ কিছু অভিনয়ও করেন। একই সঙ্গে নিজস্ব নাট্যদল 'দ্য অ্যামেচার শেকসপীরিয়ান'–এ নাট্যদলে অভিনয় করে যাচ্ছেন। তাঁর 'দ্য অ্যামেচার শেক্সপিয়রিয়ানস্ নাট্যদলের সর্বশেষ প্রযোজনা 'দ্য টুয়েলভ নাইট'। নাটকটি মঞ্চস্থ হয় ১৯৪৯ সালের ২ সেপ্টেম্বর, সেন্ট জেভিয়ার্স মঞ্চে। এই পর্বে অনেকটা বিচ্ছিন্নভাবে উৎপল দত্তের থিয়েটার চর্চার প্রাথমিক প্রস্তুতি এভাবেই চলতে থাকে। দ্য অ্যামেচার শেকসপীরিয়ানস্ দলের নাট্য নির্বাচন,পরিচালনা, অভিনয়— উৎপল দত্তই ছিলেন মূল উদ্যোক্তা। এর পাশাপাশি কেনডালের সাহচর্যে অভিনয়রীতি সম্পর্কে

ধারণা এবং পেশাদারী থিয়েটারের কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন উৎপল দত্ত। সুতরাং উৎপল দত্তের নাট্য জীবনের ক্ষেত্রে এই পর্বটির গুরুত্ব অপরিসীম।

১৯৪৯সালে 'দ্য এমেচার শেক্সপিয়রিয়ানস্' নাট্যদল ভেঙে দিয়ে ওই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে ১৯৫০-এ তিনি গড়লেন 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' (এল টি জি)। শুরু হলো উৎপল দত্তের থিয়েটার চর্চার নতুন পর্ব। তিনি বুঝতে পারছিলেন ইংরেজিতে নাটক করে শৌখিনতা চরিতার্থ হতে পারে কিন্তু আদতে কিছু হবে না। ফলে বাংলায় নাটক করার আন্তরিক ইচ্ছা তিনি অনুভব করলেন। নাটক করার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি অনুভব করতে পারলেন তখনই, যখন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির স্বরূপটা বুঝলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে জনতাকে বাদ দিয়ে নাটক হয় না,একান্তে বসে নাট্যসাধনা। এই অনুভব থেকেই তিনি গড়ে তুললেন 'লিটিল থিয়েটার গ্রুপ'।

উৎপল দত্তের নির্দেশনায় এল টি জি প্রথম অভিনয় করে ইবসেনের 'ঘোস্টস' নাটক। নাটকটি বাংলায় অনুবাদ করেন শিউলি মজুমদার। অভিনয় হয় নিউ এম্পায়ার-এ ১৯৫০-এর২৬ নভেম্বর। নাটকটি বাংলার পটভূমিতে সামাজিক নাটক হিসেবে দর্শকদের কাছে গৃহীত হয়েছিল। ওই বছরই (১৯৫০ সালে) উৎপল দত্ত যোগ দিলেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘ-এ। সেখানে অভিনয় করলেন পানু পাল-এর 'ভাঙা বন্দর' নাটকে। পরিচালনা করলেন বাংলায় 'ম্যাকবেথ' রবীন্দ্রনাথ-এর 'বিসর্জন' গোগোল-এর 'রেভিজর'। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই উৎপল দত্ত গণনাট্য সংঘ ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। গণনাট্য সংঘের কিছু কিছু মতাদর্শগত ভিন্নতা, পরস্পরের প্রতি অকারণ কুৎসা, নানা মিথ্যাচার, সংঘের কর্মীদের মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি বহু কারণে উৎপল দত্ত গণনাট্য সংঘ ছেড়ে আসতে বাধ্য হলেন। তিনি লিখেছেন—

> ''.. আমি গণনাট্য সংঘে থাকতে পারলাম না। নেতৃত্বের একাংশ কোনও অজ্ঞাত কারণে আমাকে নানা উদ্ভট রাজনৈতিক বিচ্যুতির দায়ে অভিযুক্ত করতে লাগলেন।... বিসর্জন অভিনয় করেছি, সুতরাং আমি স্বভাবতই ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া ভাবধারা আমদানি করে গণনাট্যের সংগ্রামী ঐতিহ্য নষ্ট করতে চাইছি।... আমি একাধারে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী বিচ্যুতির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে পড়লাম।''[৩১]

ফিরলেন আবার লিটল থিয়েটার গ্রুপে। এল টি জি-তে উৎপল দত্তের দ্বিতীয় প্রযোজনা ইবসেন-এর 'এ ডলস হাউস'-এর অনুবাদ 'পুতুলের সংসার' নাটক। এই নাটকে অভিনয় করেছিলেন উৎপল দত্ত, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, তরুণ মিত্র প্রমুখ।

এরপর উৎপল দত্তের পরিচালনায় এল টি জি করে রুশ নাট্যকার কনস্তান্তিন সিমোনভ-এর 'রাশিয়ান কোশ্চেন' অবলম্বনে অনূদিত নাটক 'সাংবাদিক'। এটি অভিনীত হয় আই টি এফ প্যাভেলিয়নে ১৯৫২-র ৬ডিসেম্বর। নাটকটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবক্ষয়ের বিভিন্ন দিক তীব্রভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বণিক সভ্যতার ক্রীতদাস একচেটিয়া সংবাদপত্র মানুষের আত্মিক পতনকে কীভাবে ঘনিয়ে তোলে এবং প্রতিভা কীভাবে পণ্য হয়ে যায় এটিই এই নাটকের মূল উপজীব্য বিষয়।

এই পর্বে উৎপল দত্তের আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন'। নাটকটি মঞ্চস্থ হয় ১৮ জুন, ১৯৫৩। এই নাটকের প্রযোজনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে সন্ধ্যা দে লিখেছেন—

> ''নাটকটি প্রযোজনা করার একটি কারণ আছে সে সময়ের কমিউনিস্ট পার্টির এক প্রধান ব্যক্তিত্ব এস এ ডাঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' ও 'অচলায়তন' নাটক দুটিকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। এই ব্যাখ্যা উৎপল দত্ত সঙ্গত বলে মনে করেননি। এল টি জি-র 'অচলায়তন' প্রযোজনা তারই উত্তর।''[৩২]

এরপর উৎপল দত্ত মঞ্চায়ন করেন শেক্সপিয়ারের 'ম্যাকবেথ'। অনুবাদক ছিলেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। নাটকটি মঞ্চস্থ হয় ডিসেম্বর, ১৯৫৪ নিউ এম্পায়ার-এ। নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন উৎপল দত্ত, লেডি ম্যাকবেথ-এ শোভা সেন। এছাড়াও অভিনয়ে ছিলেন শেখর চট্টোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল রায়, জ্যোৎস্না ঘোষ দস্তিদার প্রমুখ। অভিনয় এবং আলোকসজ্জায় উৎপল দত্ত মুন্সিয়ানার পরিচয় দিলেও সামগ্রিকভাবে এই প্রযোজনা সমকাল অনেকের কাছে শিল্পসম্মত হয়নি। এমনকি লিটল থিয়েটার গ্রুপের প্রধান পৃষ্ঠপোষক কমিউনিস্ট পার্টির দৈনিক 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় এই নাটকের সমালোচনা করে বলা হয়—

> ''.... নাটকের প্রযোজনা আগাগোড়া যে উচু স্বরে বেঁধে রাখা হয়েছে, তাতে শেকস্‌পিয়ারের সমস্ত সূক্ষ্মতা নষ্ট হয়েছে। পুরো নাটকেই একটা অতিমাত্রায় ভৌতিক আবহাওয়া, নাটকের মূল রস লঙ্ঘিত হয়েছে।''[৩৩]

একটা বিষয় লক্ষণীয় উৎপল দত্ত একদিকে যেমন বার বার ঘুরে ফিরে বিদেশি নাট্যকার, কখনো ইবসেন কখনো শেক্সপিয়ারের নাটক করছেন সেই সঙ্গে কিন্তু এদেশের মধুসূদন, গিরিশচন্দ্র প্রমুখের নাটকও করেছেন। শেক্সপিয়ারের 'ম্যাকবেথ' করার পরই উৎপল দত্ত করলেন মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৫৬-র মার্চ মহম্মদ আলি পার্কে, বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে। আর ১৯৫৯-এ ওই একই মঞ্চে করলেন 'একেই কি বলে সভ্যতা?'। দুটি নাটকেরই

নির্দেশনায় ছিলেন উৎপল দত্ত। মধুসূদনের নাটক প্রসঙ্গে উৎপল দত্তের বক্তব্য খুব স্পষ্ট। উৎপল দত্তের মতে মাইকেলের নাটকগুলি তাঁর গণতান্ত্রিক চেতনায় আলোকিত। প্রায় সবগুলোই ভারতের সুপ্রাচীন সামন্ততন্ত্রের ধ্বসে যাওয়ার কাহিনি; সে-ব্যবস্থার অমানবিক দিকগুলি তুলে ধরেছে। হয়তো এক-আধ ফোঁটা অশ্রু কবির গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়েছে অতীত গৌরব লুপ্ত হবার কাহিনি বলতে গিয়ে। মার্কসই বলেছিলেন, ফিউডাল সমাজের পতন থেকে ট্র্যাজেডি সৃষ্টি হয়, কিন্তু বুর্জোয়া-সমাজ যখন ধসবে তখন কমেডি ছাড়া কিছু রচিত হবেনা। সেই ট্র্যাজিক বিষণ্ণতা মাইকেলকে মাঝে মাঝে গ্রাস করেছে। নাটকের পটভূমিকা যাই হোক না কেন, নাট্যকারের নিজস্ব বিশ্ববীক্ষা তাতে একইভাবে প্রতিফলিত হয়ে চলেছে। ঠিক এই কারণেই উৎপল দত্ত মধুসূদনের নাটকের মঞ্চায়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন।

অন্যের নাটক মঞ্চায়নের পাশাপাশি এইসময় উৎপল দত্ত তাঁর নিজের লেখা বেশকিছু নাটকও নিয়মিত মঞ্চায়ন করেন।১৯৫৯-এর৩১ ডিসেম্বর মিনার্ভায় উৎপল দত্তের পরিচালনায় অভিনীত হয় তাঁরই লেখা নাটক 'অঙ্গার'। এ নাটকের পটভূ মি ছিল পঞ্চাশের দশকে ঘটে যাওয়া একটি মর্মান্তিক ঘটনা-চিনাকুড়ি কয়লা খনি দুর্ঘটনা। কাহিনি, মঞ্চ ও নেপথ্যের বিভিন্ন কাজ, সংগীত, আলোর অসামান্য ব্যবহার, সবমিলিয়ে 'অঙ্গার' মঞ্চ একটি সফল প্রযোজনা। নাটকটির উপস্থাপনা বাংলা থিয়েটারে সম্পূর্ণ নতুন জোয়ার নিয়ে আসে। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'অঙ্গার' নাটকের মঞ্চায়ন প্রসঙ্গে বলেছেন—

> ''এ ধরনের নাটক বাংলাদেশে আছে বলে মনে হয় না।... নাট্যমঞ্চের সাজসরঞ্জাম যাকে Production ও Stage Craft বলে, চমৎকার। শেষ দৃশ্যটি অপূর্ব। ... তাই বলছি অঙ্গার ভালো লেখা এবং ভালো অভিনয়। এই ধরনের জিনিস বাংলায় নেই। এবার কি সত্যিই বাংলা নাটকের মোড় ফিরবে?''[৩৪]

তবে সেদিন গণনাট্য সংঘের অনেকেই এই নাটকের আঙ্গিকের প্রাধান্যের অভিযোগ তুলে উৎপল দত্তকে তীক্ষ্ণ বাক্য মানে বিদ্ধ করেন। পক্ষান্তরে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মতো কিছু মানুষজন লিটল থিয়েটারের এই প্রযোজনাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। উৎপল দত্ত লিখেছেন—

> ''....তাঁরা আঙ্গিকের প্রাধান্যের অভিযোগ তুললেন। অভিনয়কে নাকি ভাসিয়ে নিয়ে গেছে যান্ত্রিক কলাকৌশল। পক্ষান্তরে হেমাঙ্গ বিশ্বাস প্রায় টেবিল চাপড়ে লিটল থিয়েটারকে সমর্থন করলেন; বললেন বিষয়বস্তু দিক থেকে একটুও আপোষ না করে পেশাদার থিয়েটারের সাম্রাজ্যে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে লিটিল থিয়েটার।''[৩৫]

এই নাটকে প্রায় একটা জনতাকে মঞ্চে তুলে আনা হয়েছে। সবমিলিয়ে বাংলা মঞ্চে যুগ চেতনার এক অসমসাহসী দলিল 'অঙ্গার' নাটক। এরপর উৎপল দত্তের নির্দেশনায় এল টি জি প্রযোজনা করে উৎপল দত্তের আরেকটি মৌলিক নাটক 'ফেরারী ফৌজ'। নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ১৯৬১-র ২৮ শে মে মিনার্ভা মঞ্চে। নাটকের পটভূমি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরবর্তী সময়। তরুণ বিপ্লবী অশোকের ব্যক্তিসত্তা ও বিপ্লবীসত্তার দ্বান্দ্বিকতা এই নাটকের কেন্দ্রীয় আখ্যান। বৃদ্ধ যাজকের মৃত্যুকে ঘিরেও এক করুণ অন্তর্বয়ন গড়ে উঠেছিল এই প্রযোজনায়। এ নাটকে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভা সেন, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, নিমাই ঘোষ প্রমুখ। মঞ্চ, আলো, সঙ্গীত, অভিনয় প্রভৃতি সবদিক থেকে এটি উৎপল দত্তের আরেকটি সফল প্রযোজনা।

লিটিল থিয়েটার গ্রুপ-পর্বে উৎপল দত্তের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নাট্যকর্ম হল 'তীর' নাটক। এই নাটকের প্রেক্ষাপট সত্তরের দশকের নকশালবাড়ি আন্দোলন। আদিবাসী ক্ষেতমজুর ও ভূমিহীন কৃষকদের সশস্ত্র বিপ্লব উৎপল দত্ত এই নাটকে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। উৎপল দত্ত লিখেছেন—

> ''যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার পরেই নকশালবাড়ি বিদ্রোহ, জুন' এবং রাজনৈতিক বিভ্রান্তির মধ্যে লিটিল থিয়েটারের পদক্ষেপ।... ভেবেছিলাম, কৃষক-যোদ্ধার বীরত্ব অমরগাথা হয়ে থাকবে, পথটা যদি ভুলও হয় তবু থাকবে। ... রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত আরও যেন গুলিয়ে গেল মাথার মধ্যে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে অধৈর্যপনা ও অতি-বামপন্থী ধ্যানধারণা আমাদের অনেককে পেয়ে বসেছিল। লিটিল থিয়েটারের সদস্যবৃন্দের অনেকেই আমাদের সঙ্গে একমত ছিলেন না, কিন্তু 'তীর' নাটক একান্তভাবে জোতদারের অত্যাচার, কৃষকের প্রতিরোধ ও পুলিসের জুলুমে আবদ্ধ থাকায় সেটা মঞ্চস্থ করতে সকলে সহযোগিতা করছিলেন।''[৩৬]

নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ১৬ ডিসেম্বর ১৯৬৭, মিনার্ভা মঞ্চে। নাটকটির মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে উৎপল দত্ত অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করেন। 'তীর' নাটকের প্রযোজনা প্রসঙ্গে আমরা দর্শন চৌধুরী বক্তব্যএখানে উদ্ধৃত করতে পারি। তিনি লিখেছেন,''মঞ্চে একসঙ্গে চার জায়গায় অভিনয় চলছে। পিছন মঞ্চে উঁচু টিলার মতো জায়গা থেকে সুকরা টুডু মাদলের তালে গ্রামে সঙ্কেত দিচ্ছে। নিচে মঞ্চের মাঝে প্রাক্তন সৈনিক, বর্তমানে কৃষক রণবাহাদুর গ্রামবাসীদের ফৌজি শিক্ষা দিচ্ছে। সামনের বাঁদিকে একজন কামারশালায় অস্ত্র বানিয়ে চলেছে, ডানদিকে কমরেড বিপ্লবের ক্লাস চালাচ্ছে। মঞ্চ বিভাজনের মধ্য দিয়ে গ্রামের নানা মানুষের নানা কর্মের প্রস্তুতি দেখানো হয়। সর্বকর্মই আবর্তিত বিপ্লবের প্রস্তুতিতে। 'থিয়েটারে প্রকৃত শিল্পীর হাতে যে কোনো সামান্য জিনিস বাঙ্ময় হয়ে উঠতে

পারে।' 'তীর' প্রযোজনা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত"।[৩৭]

উৎপল দত্ত তাঁর 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ পর্ব'-এর অধিকাংশ নাট্য প্রযোজনা করেছেন মিনার্ভা থিয়েটারে। কিন্তু গ্রুপের মধ্যে নানা কারণে দলীয় মতবিরোধ একটা সময় এমন জায়গায় পৌঁছায় যে উৎপল দত্ত গ্রুপ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হন। পাশাপাশি মিনার্ভা থিয়েটার থেকেও তিনি বেরিয়ে আসেন। মিনার্ভা থিয়েটারের সঙ্গে উৎপল দত্তের দীর্ঘ প্রায় দশ বছরের (জুন,১৯৫৯-'৬৯) পথচলা শেষ হয়১৯৬৯-এ।

উৎপল দত্ত লিটিল থিয়েটার গ্রুপ ছেড়ে বেরিয়ে এসে প্রথমে 'বিবেক নাট্যসমাজ' (১৯৬৯-৭১) এবং পরে 'পিপল্‌স লিটিল থিয়েটার' (পি এল টি) গ্রুপ তৈরি করে এই সময় তিনি তাঁর নাট্যকর্মের ধারা অব্যাহত রাখেন। এই পর্বে দেখা যায় উৎপল দত্ত-র আর সে ভাবে কোন বাঁধা মঞ্চ রইল না। নির্দিষ্ট কোন মঞ্চ না থাকায় তাঁকে এবার ভিন্ন ভিন্ন মঞ্চ ব্যবহারের উপযোগী মঞ্চস্থাপত্য নির্মাণ করতে হল। দর্শন চৌধুরী উৎপল দত্তর এই দ্বিতীয় পর্বের নাট্যায়নের মৌলিক পরিবর্তনের কথা প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> ''মিনার্ভার মতো বহুতল জুড়ে বহুমাত্রিক 'ভিস্যুয়াল গ্রাঞ্জার' নির্মাণের সুযোগ রইল না। তৈরি হল অতি দ্রুত উপস্থাপনার মতো মঞ্চসজ্জা। অভিনয়ান্তে অতি সহজে যাতে খুলে নেওয়া যায়।"[৩৮]

এখানে প্রসঙ্গক্রমে আমরা উল্লেখ করতে পারি মিনার্ভার পরের বেশকিছুটা সময় উৎপল দত্ত যাত্রামঞ্চে অভিনয় করেন। সেই যাত্রাভিনয়ের অভিজ্ঞতাই এক্ষেত্রে উৎপল দত্তকে সাহায্য করেছে। যাত্রার নিরাভরণ মঞ্চের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তিনি ক্রমে এগিয়ে চলেন আধুনিক থিয়েটারের বুদ্ধিদীপ্ত উপস্থাপনার দিকে। উৎপল দত্তের নাটক রচনা ও প্রযোজনার প্যাটার্নও এই পর্বে পাল্টে যেতে থাকে।

পি.এল.টি পর্ব-এ উৎপল দত্তের প্রথম নাট্য প্রযোজনা 'টিনের তলোয়ার'। নাটকটি অভিনীত হয় ১২ অগাস্ট, ১৯৭১ রবীন্দ্র সদন মঞ্চে। এটি নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রযোজনা। নাট্যকার ও পরিচালক উৎপল দত্ত স্বাদেশিকতার উন্মেষ পর্বে বাংলা রঙ্গমঞ্চের ভূমিকা বদলের পূর্বাভাসটিকে চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন এ নাটকে। সন্ধ্যা দে লিখেছেন—

> ''...অপেরাধর্মী নাটকীয়তার ব্যঞ্জনা, নাট্য-সংগীতের সুন্দর ব্যবহার এবং এরই সঙ্গে তাল মিলিয়ে উৎপল দত্ত, শোভা সেন ও ছন্দা চট্টোপাধ্যায়ের নিপুণ অভিনয়, সুরেশ দত্ত কৃত মঞ্চমায়া ও তাপস সেনের আলোক সম্পাত 'টিনের তলোয়ার'কে একটি কালজয়ী প্রযোজনায় পর্যবসিত করেছে।"[৩৯]

এইপর্বে উৎপল দত্তেরপরবর্তী একটি উল্লেখযোগ্য নাট্যকর্ম হল 'ব্যারিকেড'। নাটকটি অভিনীত হয় ১৯৭২-এর ২৫ ডিসেম্বর, কলামন্দির-এ। এই নাটকের মাধ্যমে জার্মানির নাৎসিবাদের দানবীয় নগ্ন স্বরূপটি তুলে ধরা হয়েছে। একজন কমিউনিস্ট থেকে সাধারণ গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষও যে এই ভয়াবহ সন্ত্রাসের শিকার— উৎপল দত্ত তা অনেকটা থ্রিলারের ভঙ্গিতে দর্শকের সামনে উপস্থিত করেছেন। এই প্রযোজনায় বিস্ময়কর ছিল চরিত্র পরিচিতির মুহূর্তগুলি— এক দীর্ঘ প্রাচীরের ঘুলঘুলির ভিতর থেকে ক্রমশ বেরিয়ে আসে নাটকের ভয়ার্ত চরিত্রগুলি, ম্লানায়মান আলোয় যা মুদ্রিত হয়ে যায় দর্শকের চোখে। পি.এল.টি পর্বে উৎপল দত্তের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রযোজনা 'দুঃস্বপ্নের নগরী'। উৎপল দত্তের পরিচালনায় নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়১৯৭৪-এ১৬ মে কলামন্দির-এ। সত্তরের দশকের জরুরি অবস্থার প্রাক্-লগ্নে সন্ত্রাস-কবলিত কলকাতার যাপন-যন্ত্রণার ছবি ধরা পড়েছিল এই নাটকে। নাট্যকাহিনি রচনায় এবং প্রযোজনায় উৎপল দত্ত যে বাস্তবতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন তা বহুদিন পর্যন্ত দর্শককের মনে দাগ রেখেছিল। মঞ্চ পরিকল্পনায় উৎপল দত্ত প্রায় বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। একই দৃশ্যে কার্জন পার্ক, চৌরঙ্গিপাড়ার ব্যস্ততা, অফিসবাড়ি, রাজপথ যেন চলচ্চিত্রের ফ্রেমের মতো ধরা পড়েছিল। এরপর ১৯৭৮-এর ২৬ জানুয়ারি রবীন্দ্র সদন মঞ্চে উৎপল দত্ত প্রয়োজনা করলেন 'তিতুমীর' নাটক। এই নাটকে চব্বিশ পরগনার নারকেলবেড়িয়ার কৃষক তিতুমীরের সংগ্রামকে যেভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের অভিমুখে নিয়ে গিয়েছেন উৎপল দত্ত তার যাথার্থ্য এবং বাস্তবতা নিয়ে সমকালে অনেকে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু নাট্যঘটনার বিন্যাস এবং স্বভাববাদ ও বাস্তবতার যুগ্মতায়, প্রয়োগ কৌশলে এ নাটক যথেষ্ট দর্শক সমাদর পেয়েছিল। তিতুমীরের ভূমিকায় অসামান্য অভিনয় করেছিলেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন উৎপল দত্ত, সমীর মজুমদার, মৃণাল ঘোষ, শ্যামল ভট্টাচার্য ও শোভা সেন। মঞ্চ পরিকল্পনাতেও যেভাবে বাঁশের কেল্লার সম্মুখভাগ মঞ্চে প্রতিস্থাপিত হয়েছিল, তা বাংলা রঙ্গমঞ্চে সম্পূর্ণ অভিনব। এরপর উৎপল দত্ত আবার ফিরে এসেছেন মধূসুদন-গিরিশ ঘোষ-এ। মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রতিভাদীপ্ত জীবনের কাহিনি অবলম্বনে উৎপল দত্ত রচনা করলেন 'দাঁড়াও পথিকবর'। উৎপল দত্তের পরিচালনায় এটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ৪ ডিসেম্বর, ১৯৮০, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট মঞ্চে। উৎপল দত্তের এই নাটক রচনা বেশ বস্তুনিষ্ঠ এবং আবেগ বর্জিত। চিরাচরিত পদ্ধতিতে নাট্যরচনার আঙ্গিক ত্যাগ করে তিনি ছোট ছোট ঘটনার সম্বন্বয়ে নাট্যকাহিনি নির্মাণ করেছেন। যেমন বেলগাছিয়া থিয়েটারের জন্য মধুসূদনের নাট্যরচনা 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নাটকের মহলা, 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনা, মধুসূদন কর্তৃক 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ, বিদ্যাসাগর- মধুসূদন সম্পর্কের বিন্যাস, ভার্সাই-এ চতুর্দশপদী কবিতা রচনা ইত্যাদি ছোট ছোট

প্রাসঙ্গিক ঘটনার অনুষঙ্গে নাট্য কাহিনি গড়ে উঠেছে। মঞ্চ, আলো অভিনয়, সমস্ত দিক থেকেই যেন নতুন করে পি এল টি-র গৌরব প্রতিষ্ঠিত করেছিল। মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন উৎপল দত্ত। এছাড়া হেনরিয়েটার চরিত্রে নীলিমা দাস এবং বিদ্যাসাগর চরিত্রে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ও অসামান্য অভিনয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এরপর করলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'। এটি প্রথম অভিনীত হয় ১৯৮২-র ৬ নভেম্বর ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট মঞ্চে। নাটকটিতে অভিনয় করেছিলেন উৎপল দত্ত, তৃপ্তি গঙ্গোপাধ্যায়, মৃণাল ঘোষ, বিষ্ণুপ্রিয়া দত্ত, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

উৎপল দত্তের থিয়েটার মূলত পলিটিক্যাল থিয়েটার। তাঁর নাট্যচর্চার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভালো করে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সমাজ বিশ্লেষণ এবং শ্রেণি সংগ্রামের স্বরূপ উপলব্ধি। তিনি মনে করেন শ্রেণি সংগ্রামের সঠিক পথ অনুসন্ধানের একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত পন্থা মার্কসবাদ। সেই মার্কসবাদকে ভিত্তি করে তিনি তাঁর বক্তব্য থিয়েটারের মাধ্যমে তুলে ধরতে চেয়েছেন। থিয়েটার উৎপল দত্তের কাছে নিছক অবসর বিনোদনের আশ্রয় ছিল না, সমাজের প্রলেতারিয়েত শ্রেণির কাছে সুচিন্তিত বক্তব্য পৌঁছে দেবার মাধ্যম হিসেবেই তিনি থিয়েটারকে দেখেছেন। এ বিষয়ে উৎপল দত্তের বক্তব্য খুব স্পষ্ট। তিনি মনে করেন নাটকের বিষয়বস্তু ছাড়াও নিশ্চয়ই একটা শ্রেণির প্রশ্ন আছে। সেটা কোন শ্রেণির? এর উত্তরে তিনি বলেছেন কোন শ্রেণির পক্ষে, কোন শ্রেণির বিপক্ষে তা নাটকটা পড়লেই বোঝা যায়। এটা তো শুধু বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেই নয়, নাটকের ফর্ম, আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও একটা শ্রেণিগত প্রশ্ন থাকে। একজন নাট্যব্যক্তিত্ব কীভাবে অভিনয় করবে, কীভাবে মঞ্চ সাজাবে, কীভাবে আলোক সম্পাত করবে-তার ভেতরেও থাকে তার শ্রেণিগত অবস্থান, শ্রেণিগত দৃষ্টিভঙ্গি।

বিশ শতকের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে থিয়েটার করতে গিয়ে উৎপল দত্ত উপলব্ধি করেছেন থিয়েটার কাজটা আপাদমস্তক মতাদর্শগত। সেই মতাদর্শের জায়গা থেকে উৎপল দত্ত তাঁর থিয়েটার চর্চা চালিয়ে গেছেন। আর তাই তাঁর নাটকে একটি বিশেষ রাজনৈতিক স্বর বারবার ধ্বনিত হয়েছে। একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উৎপল দত্ত কিন্তু ছিলেন আগাগোড়া একজন নাটকের মানুষ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তিনি নন। কোন রাজনৈতিক তত্ত্ব দাঁড় করানো তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষকে রাজনৈতিকভাবে সচেতনত করা আর সেই সচেতনতার মাধ্যম তাঁর নাটক। নাটক নিয়ে লড়াই করতে করতে তিনি রাজনৈতিক পথ বেছে নিয়েছেন। ফলে তাঁর নাটকে রাজনৈতিক বিষয় এলেও রাজনৈতিক তত্ত্ব প্রচারসর্বস্ব হয়ে ওঠেনি। আসলে তিনি কমিউনিস্ট হলেও পার্টির প্রতি তাঁর অন্ধ আনুগত্য ছিলনা। সমাজে শ্রেণিদ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে মেহনতি সাধারণ মানুষের

পক্ষ অবলম্বন করায় ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। তাই যখন তাঁর মনে হয়েছিল একটি কমিউনিস্ট দল শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থবিরোধী ভূমিকা নিয়েছে তখন তিনি নির্বিধায় নকশাল দলকে সমর্থন করেছেন। লিখেছেন 'তীর'-র মত নাটক। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—

> ''রাস্তায় ভায়ে-ভায়ে সংঘর্ষ চলছে, আর শত্রু হাসছিল। সিপিএমের সঙ্গে সিপিআই(এম-এল)-এর সদস্যদের রক্তাক্ত বিরোধ। ... মনে করেছিলাম প্রসাদুজোতে পুলিশের নৃশংস গুলিচালনার বিরুদ্ধে আমাদের মুখ খুলতেই হবে, যেই সরকারে থাকুক না কেন।''[৪০]

এখানেই উৎপল দত্তের রাজনৈতিক থিয়েটারের সার্থকতা। তাঁর থিয়েটার কোন একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের প্রচার সর্বোচ্চ হয়ে ওঠেনি, তা হয়ে উঠেছে মেহনতী সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতার অন্যতম হাতিয়ার।

উৎপল দত্ত মঞ্চসজ্জা, রূপসজ্জা, আলো ও সংগীতের প্রয়োগ অর্থাৎ নাট্য আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও নতুন দৃষ্টিভঙ্গির স্বাক্ষর রেখেছেন। এই জন্য তিনি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছেন। কিন্তু অতিরিক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে অনেকে উৎপল দত্তের নাট্য আঙ্গিকের বিরূপ সমালোচনাই করেছেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়, উৎপল দত্ত নাটকে যেখানে বৃষ্টি দরকার সেখানে বৃষ্টি নামান, যেখানে আগুন লাগানোর দরকার সেখানে আগুন। এক্ষেত্রে আমরা উৎপল দত্তের বক্তব্য তুলে ধরতে পারি। তিনি বলেছেন—

> ''থিয়েটার নানা শিল্পের মিলিত সৃষ্টি, আর এই মিলের ভিত্তি হল পরস্পরের সঙ্গে ক্রমশ একাত্ম হওয়ার প্রচেষ্টা। শব্দকে হতে হবে বর্ণ, বর্ণকে হতে হবে শব্দ। আর এ থিয়োরির শত্রু হলেন বাস্তববাদীরা, অর্থাৎ ফোটোগ্রাফ পন্থীরা। এঁরা ভুলে যান শিল্প ঠিক জীবন নয়; শিল্প জীবনোধর্ব, কালোধর্ব, দেশোধর্ব একটা কিছু। জীবন প্রবহমান; থিয়েটার স্থিতু। জীবন সম্পূর্ণ, নাটক খণ্ডিত। এই খণ্ডিতের মধ্যে সম্পূর্ণতার চেহারাটা ধরতে গেলেই খণ্ডচিত্রকে একটা বাস্তবোত্তর রূপ দিতে হবে। রঙে, ছন্দে, বাঁধতে হবে তাকে।''[৪১]

অর্থাৎ নাট্যায়নের প্রয়োজনেই তিনি নাট্য আঙ্গিকের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। কিন্তু তা করতে গিয়ে তিনি কখনোই আড়ম্বরপূর্ণ মঞ্চসজ্জার দিকে যাননি। এক্ষেত্রে তিনি পেশাদারী থিয়েটারের গতানুগতিক ধারা থেকে সরে এসেছেন। পেশাদারী থিয়েটারে বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত নাটকের দৃশ্যসজ্জায় আঁকা সিনেরই চল ছিল। যার মধ্যে না ছিল কোন বাস্তবের ইঙ্গিত, না ছিল কোন ব্যঞ্জনা। গণনাট্য সংঘ প্রথম এই ধরনের মঞ্চ ব্যবস্থা থেকে সরে এসে একেবারে

অনাড়ম্বর মঞ্চসজ্জার প্রচলন করে। খুব সহজেই গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে নাটককে নিয়ে যাওয়ার সুবিধার্থে মঞ্চকে করা হয় অনাড়ম্বর। উৎপল দত্তও এই পথেই হেঁটেছেন। তবে তিনি মনে করেন অল্প খরচেও দৃশ্যসজ্জা সৃষ্টি করা যায়। কীভাবে তা সম্ভব? তিনি নিজেই বলেছেন—

> ''থিয়েটার এবং দর্শক পেলেই আমি যবনিকা বাদ দেব। তারপর বাদ দেব উইংস্, বর্ডার প্রভৃতি। ... মেঝেটাকে নানা আকারের বেদী দিয়ে ভরে দেব; এলোমেলো এদিকে ওদিকে সিঁড়ি সাজাব। অভিনেতা চলতে গেলেই যাতে সিঁড়ি ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। উচ্চতর বেদী ব্যবহার করে মেঝে আর ব্যাটেন লাইটের মধ্যবর্তী বিশাল জায়গাটা ব্যবহার করব। ঝড় বোঝাতে ব্যবহার করব ক্রেগ-এর আঁকা রেখা কাটা একটি কালো পর্দা বা ব্রেখ্ট্ বর্ণিত বিদ্যুৎ-আঁকা একটা ধূসর পর্দা। জল বোঝাতে ব্যবহার করব নীল পোশাক পরা জনা কুড়ি নর্তকী। আগুন বোঝাতে হয়তো উদয়শঙ্করের প্রদর্শিত কিছু লাল রিবন নাড়ব। বৃষ্টি বোঝাতে গুটি দশেক ছাতা খুলে ধরব। যুদ্ধক্ষেত্র বোঝাতে পর্দা আর বেদীগুলোকে নাড়াব ভীম বেগে। মাতালের চোখে কলকাতা দেখাব: কার্ডবোর্ডের মনুমেন্ট আর হাইকোর্টকে চাকায় বসিয়ে ছুটিয়ে দেব মঞ্চের উপর দিয়ে, এলোমেলো ডগমগ কলকাতা-। যাক্, করব অনেক কিছুই। কিন্তু যা করব তা থিয়েটারি ঢং-এই করব। চিত্রপটের খোকা-সুলভ বাস্তবতা আমদানি করব না। অন্যশিল্প থেকে ধার করে করব না।''[৪২]

সুতরাং তাঁর বক্তব্য খুব স্পষ্ট। তিনি মঞ্চসজ্জার ক্ষেত্রে সবই ব্যবহার করেছেন কিন্তু সেটা বাস্তবতার কথা মাথায় রেখে। অধ্যাপক নাট্যসংগঠক সৌমিত্র বসু উৎপল দত্তের নাট্যায়নের মূল্যায়ন করতে গিয়ে যথার্থই বলেছেন—

> ''মনে রাখা চাই, ... একটি বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শকে তীব্রভাবে প্রকাশ করেন তিনি, এবং সে কাজে আঙ্গিককে কখনই অবহেলা করেন না। তাঁর নাটক সব সময়েই উত্তেজক, আবহ বা অভিনয়ের সুর বাজে প্রখর তীব্রতায়। বহু মানুষকে নিয়ে বিশাল মঞ্চছবি তৈরি করার ব্যাপারে তাঁর অসম্ভব আগ্রহ এবং দক্ষতা ছিল।''[৪৩]

বাংলা থিয়েটারে শম্ভু মিত্র এবং তাঁর বহুরূপী গ্রুপ থিয়েটার শিল্পের জায়গা থেকে একটা অন্যত্র স্তরে নিয়ে গেছেন থিয়েটারকে, আর তারই সমান্তরালে উৎপল দত্ত রাজনৈতিক থিয়েটারের এক ভিন্ন দর্শনের প্রবাহ বইয়ে দিয়েছিলেন বাংলা থিয়েটারে। এখানেই উৎপল দত্তের থিয়েটারের

ধারা গতানুগতিক থেকে স্বতন্ত্র।

উৎপল দত্তের পর পরই বাংলা থিয়েটারে আর্বিভাব ঘটে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (জন্ম: ৩০ শেসেপ্টেম্বর ১৯৩৩, মৃতু :১ অক্টোবর ১৯৮৩)। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন থিয়েটারে কাজ শুরু করেন, ততদিনে বাংলা থিয়েটারের ঐতিহাসিক পালাবদল ঘটে গেছে। চারের দশকে প্রথমে গণনাট্য সংঘ এবং তারপর ষাটের দশকে নবনাট্য আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে পেশাদারী থিয়েটারের বিকল্প একটি অপেশাদার নাট্যের ধারণা বাংলা তথা সারা ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিতা পেয়ে যায়। সেই সঙ্গে যুক্ত হল বিশ্ব থিয়েটারের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার শৈল্পিক প্রয়াস। শম্ভু মিত্র এবং উৎপল দত্তের মতো নাট্যব্যক্তিত্ব অভিনয়ের জন্য দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে কখনো ইবসেন, কখনো ব্রেখটের নাটক মঞ্চস্থ করতে থাকেন। অবশ্য নব চেতনার অন্বষণে কখনো মধূসুদন,কখনো গিরিশচন্দ্র কিংবা রবীন্দ্রনাথেও তাঁরা আশ্রয় খুঁজেছেন। বলাবাহুল্য বিশ্বনাট্যের সঙ্গে এই যোগ বাংলা থিয়েটারকে সমৃদ্ধ করেছিল বৈকি। বিশেষ করে শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্তের একেরপর এক সাফল্যে বাংলা থিয়েটার উন্নতির শীর্ষে পৌঁছে যায়। তাঁদের সাফল্যে পরবর্তীকালে অনেকেই এইধারা অনুসরণ করেন। এই পরিমণ্ডলেই অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর থিয়েটার চর্চা শুরু করেন।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর নাট্য জীবন শুরু করেন গণনাট্য সংঘের ছত্রছায়ায়। মার্কসবাদে বিশ্বাসী অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রাবস্থা থেকেই গণনাট্যে অভিনয় ও নির্দেশনার কাজ শুরু করেন। গণনাট্য সংঘের উত্তর দমদম শাখার হয়ে মঞ্চস্থ করেন তাঁরই লেখা মৌলিক নাটক 'সাঁওতাল বিদ্রোহ'। এরপর গণনাট্য সংঘের 'নান্দীকার শাখা' তৈরি করে কিছুদিন তাঁর নাট্যচর্চা চালিয়ে যান। কিন্তু নানা কারণে গণনাট্য সংঘের সঙ্গে তাঁর মানসিক দূরত্ব এবং বিচ্ছিন্নতা বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তিনি গণনাট্য সংঘ থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেন। ঠিক যে সব দুঃখের কারণে একজন সৎ গুণী শিল্পীকে গণনাট্য ছাড়তে হয় অবশেষে অজিতেশকেও তাই করতে হয়। ১৯৬০-এর ২৯ জুন দুই সহ-অভিনেতা অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দীপেন্দ্র সেনগুপ্তের সহায়তায় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠা করলেন 'নান্দীকার' থিয়েটার গ্রুপ।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নান্দীকার থিয়েটার গ্রুপের জন্য প্রথম করলেন ইবসেনের 'ঘোস্টস' অবলম্বনে নাটক 'বিদেহী'। নাটকটি অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় প্রথম অভিনীত হয় ১১ সেপ্টেম্বর,১৯৬০-এ রঙমহল মঞ্চে। পরপর করলেন 'দাও ফিরে সে অরণ্য' (১৯৬০-এর ৩০ সেপ্টেম্বর), 'সেতুবন্ধন' (১৯৬১-র ১১ ফেব্রুয়ারি), রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' (১৯৬১-র ১১মে)। কিন্তু এইসব নাট্য প্রয়োজনায় তেমন উল্লেখযোগ্য কোন স্বাক্ষর তিনি রাখতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক, নাট্যকার দেবাশিস মজুমদার মূল্যায়ন যথার্থ। তিনি লিখেছেন—

''এই শতাব্দীর (বিংশ) শ্রেষ্ঠ মানে, যে কটি প্রযোজনা আজ প্রতিষ্ঠিত তার প্রায় সিংহ ভাগই অজিতেশের কাজ শুরুর আগেই মঞ্চস্থ হয়ে গেছে— স্বাভাবিকভাবেই এই তুমুল সাফল্যের মধ্যে তাঁকে খুঁজে নিতে হয়েছে তৃতীয় একটি পথ।''[৪৪]

রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' করার পর তিনি আবার ফিরে গেলেন বিদেশি নাটকে। ইতালিয় নাট্যকার লুইগি পিরানদেল্লো-র 'সিক্স ক্যারেক্টারস ইন সার্চ অফ এন অথর' অবলম্বনে করলেন 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র' নাটক। নাটকটির প্রযোজনা প্রসঙ্গে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত লিখেছেন,

''একদিন অজিতেশ আমার ঐ শ্যামবাজারের একান্ত ঘরটায় ... যখন বলছে, 'কি করব কিছু বুঝতে পারছি না' তখন বললাম আমার কাছে একটা manu-script আছে। 1st act- টা আমি পড়ে শোনালাম তখন রাত্রি ১টা। ও বলল আর পড়োনা, আমি চলে যাচ্ছি। আমাকে script-টা দিয়ে দাও।... ও script-টা নিয়ে চলে গেল। কদিন পরে আমরা script-টা নিয়ে দুজনে বসলাম,...''।[৪৫]

বাকিটা ইতিহাস। বস্তুত এই নাটকের প্রযোজনাই নান্দীকার-কে বাংলা থিয়েটারের জগতে স্থায়ি প্রতিষ্ঠা এনে দেয়। 'বহুরূপী', এল.টি.জি-র পর উঠে এলো 'নান্দীকার' গ্রুপ থিয়েটার। ১৯৬১-র ১২ নভেম্বর অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় রঙমহল মঞ্চে অভিনীত হলো 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র'। নাটকে বাবার ভূমিকায় স্মরণীয় অভিনয় করেছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ে ছিলেন অভিনেত্রী মায়া ঘোষ, কেয়া চক্রবর্তী, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, অজয় গঙ্গোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, বিভাস চক্রবর্তী প্রমুখ। এই নাটকের মূল বক্তব্য জীবনে অনেক অভিনয় হয়েছে, কিন্তু মৃত্যুতে যেন কোনও চাতুরী না থাকে। এই সৎ অভিপ্রায়ের ওপর নাটকটি গড়ে উঠেছে। মানুষের সমস্ত মূল্যবোধ ও ব্যক্তিত্ব যেহেতু আপেক্ষিক সেই কারণে শুভাশুভের মত সত্যাসত্যও আপেক্ষিক। পিরানদেল্লো-র সামাজিক নীতিবোধ সম্পর্কিত এই বক্তব্যই 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র' নাটকটিতে তুলে ধরা হয়েছে। তবে এই নাট্য প্রযোজনার কারণে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমালোচিত হতে হয়েছিল। কারণ পিনারদেল্লো এক সময় ফ্যাসিস্ট নেতা মুসোলিনির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ফলে তাঁর নাটক করার বিষয়টি কমিউনিস্ট পার্টি ভালোভাবে নেয়নি। কিন্তু আমাদের মনে হয় বিষয়টি সংকীর্ণ দৃষ্টি থেকে দেখা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে দেবাশিস মজুমদারের বক্তব্য আমরা এখানে উদ্ধৃত করতে পারি। তিনি বলেছেন, ''পিনারদেল্লো ইতালিয় নাট্যধারায় ভিন্ন স্বাদ আনতে সক্ষম হয়েছিলেন প্রধানত তিনি 'রোমান্টিক ভাবলুতার বদলে মননশীলতা আনেন এবং মননশীল থিয়েটারের পথনির্দেশ করেন।' ... অর্থাৎ আধুনিকতার রূপারূপ

চিহ্নিত হয়েছিল এই নাটককারের মধ্য দিয়ে ইতালিয় নাট্য নির্মাণে। সেই আধুনিকতা সেই যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিকেই সমপাতিক মনে হয়েছিল প্রায় চল্লিশ বছর পর এই বাংলা তথা ভারতবর্ষে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের।"[৪৬] এখানে অজিতেশ একদিকে প্রথাগত মঞ্চকে ভাঙবার চেষ্টা করেছেন আর অন্যদিকে ষাটের দশকের দম বন্ধ করা পরিবেশকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। সেজন্য মঞ্চে এক অদ্ভুত ধরনের আলো-আঁধারির ধূসরতা নিয়ে আসা হয়। অভিনেতার পোশাকের মধ্যেও এক ধরনের বিবর্ণ রং ব্যবহার করে সেই সময়কার গোটা সমাজের মূল দ্বন্দ্বের অনেকটাই স্পন্দিত করার চেষ্টা করেছিলেন এই নাট্যে।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এরপর করলেন রুশ সাহিত্যিক ও নাট্যকার অন্তন চেখভ-এর 'দ্য সোয়ান সং' শীর্ষক একাঙ্ক নাটক অবলম্বনে 'নানা রঙের দিন' (১৯৬১-র ডিসেম্বর)। রবীন্দ্রনাথের 'বদনাম' গল্প অবলম্বনে করলেন 'বদনাম' (১৯৬১-র ডিসেম্বর) নাটক। তবে সাফল্যের দিক থেকে এইসব প্রযোজনা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। এরপর তিনি করলেন আন্তন চেখভ-এর আর একটি বিখ্যাত নাটক 'দ্য চেরী অর্চার্ড' অবলম্বনে 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী'। নাটকটি রূপান্তর এবং নির্দেশনায় ছিলেন স্বয়ং অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ১০ই নভেম্বর ১৯৬৪, মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে।

চেখভ-এর নাটকে জীবন সম্পর্কিত যে বেদনাময় অভিজ্ঞতা ও ফলহীন পরিণাম একটি বির্বণ অস্তিত্বের মতো সর্বময় হয়ে ওঠে, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রযোজনায় তা যথাযথ ভাবে তুলে ধরেছেন। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন চিন্ময় ঘোষ, চিন্ময় রায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, বিভাস চক্রবর্তী, অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়, মায়া ঘোষ, লতিকা বসু। তবে নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র লালমোহনের ভূমিকায় অসামান্য অভিনয়ের জন্য বাঙালি দর্শকের মনে চিরকাল জায়গা করে নিয়েছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নাটকের মঞ্চায়ন প্রসঙ্গে তৃপ্তি মিত্র জানিয়েছিলেন—

> ''...আমি প্রথম দেখি মঞ্জরী, আমের মঞ্জরী, এবং আমি খুব মুগ্ধ হয়ে যাই। প্রোডাশানাল ধরণও অন্যরকম ছিল, আর অনেকের অভিনয়ই ভাল ছিল, তবে কিছু কাঁচা অভিনয়ও যে ছিল না বলব না, অনেকের অভিনয়ই একটু কাঁচা লেগেছিল- তবে ওঁর নিজের অভিনয়ের কোনো তুলনা করাই শক্ত, বিশেষ করে শেষ দৃশ্যে। ওরকম অভিনয় ক'জন ওরকম করে করতে পারে আমি ঠিক জানি না। কি বলব, আমাকে অভিভূত করেছিল।"[৪৭]

শব্দ নির্বাচন এবং তার বিন্যাসে এক ভিন্ন নির্মাণের প্রয়াস ছিল এই রূপান্তরে। কী সেই ভিন্ন নির্মাণ? এক্ষেত্রে দেবাশিস মজুমদারের মূল্যায়ন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে আমরা সেটি এখানে উদ্ধৃত করছি।

তিনি লিখেছেন—

> ''এই নাটকের চরিত্র অভিনয়ে অজিতেশ এক ধরনের সহজতা আনলেন- প্রধানত যা নাগরিক নয়। আর এখানে দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে গেল- সমসাময়িক বাংলার শ্রেষ্ঠ অভিনেতা যে দু-জন তাঁদের থেকে সম্পূর্ণ অন্য এক স্বাদ পেল দর্শক সাধারণ যাঁকে অনেকটাই চেনা-কাছের বলে মনে হল। দ্বিতীয়ত এখান থেকেই গল্প তৈরি হল অজিতেশ একেবারে চাষ-জমিনের কাদামাটি পায়ে মেখেই মঞ্চে উঠেছে। ...'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী', প্রযোজনায় আমরা দেখছি— অজিতেশ সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ক্ষমতায় তাঁর প্রযোজনাকে বাঁধছেন এককের দুরন্ত আধিপত্যে।''[৪৮]

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরবর্তী সাড়া জাগানো নাট্যকর্ম 'শের আফগান'। মূল নাটক পিরানদেল্লো-র 'এনরিকো কোয়ার্টো'। নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৬৬-র ১২ জুলাই, মুক্তঅঙ্গন মঞ্চে। স্মৃতি-বিস্মৃতির মধ্য দিয়ে মানুষের অস্তিত্বের যে দোলাচলতা, যা কখনও কখনও কল্পনাকে বাস্তব এবং বাস্তবকে কল্পনা করে তোলে এখানে সেটিই তুলে ধরা হয়েছে। এককথায় স্মৃতি তাড়না ও রূঢ় বাস্তবের এক মিলিত সংরাগ 'শের আফগান' নাটক। নাটকে শের আফগানের ভূমিকায় অসামান্য অভিনয় করেছিলেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বরুণ সেন, দিপালি চক্রবর্তী এবং আরও অনেকে।

'শের আফগান'-র পর তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা বেরটোল্ড ব্রেশট -এর 'দ্য থ্রি পেনি অপেরা' অবলম্বনে রূপান্তরিত নাটক 'তিন পয়সার পালা'। নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ করেন ১৯৬৯-র ১৪ ডিসেম্বর, নিউ এম্পায়ার প্রেক্ষাগৃহে। এরপর 'রঙ্গনা' থিয়েটার ভাড়া নিয়ে (১৯৭০) সেখানেই এবার অজিতেশ তাঁর নাট্যকর্ম নিয়মিত ভাবে চালিয়ে যেতে থাকেন। বলাবাহুল্য এই মঞ্চটি পরবর্তীকালে প্রযোজনার মাধ্যমে বহু পরিচিত হয়ে ওঠে। আসলে গ্রুপ থিয়েটারের দলগুলির তখন মনে হয়েছিল মঞ্চ না থাকাটাই তাদের প্রধানত মৌলিক সমস্যা। এই একই কারণে শম্ভু মিত্রের নেতৃত্বে ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণে 'বাংলা নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি' (১৯৬৮) গড়ে উঠেছিল। বাংলা নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতির সহ-সভাপতি হিসেবে অজিতেশ যখন ওই মঞ্চের জন্য সাংগঠনিক লড়াই করছেন, তখন প্রায় একই সময়ে 'নান্দীকার-এর জন্য একটি স্থায়ী মঞ্চেরও তিনি সন্ধান করছেন। রঙ্গনা থিয়েটার হল তৈরি হলে প্রথমেই নামান 'তিন পয়সার পালা' এই প্রথম কোন গ্রুপ থিয়েটারের দল স্থায়ীভাবে থিয়েটার হল ভাড়া নিয়ে নিয়মিত অভিনয় করার সিদ্ধান্ত নেয়। অজিতেশ ও তাঁর 'নান্দীকার' প্রতি বৃহস্পতি, শনি ও রবিবার নিয়মিত অভিনয়

শুরু করে এই প্রেক্ষাগৃহ ভাড়া নিয়ে। (১৯৭০-এর সপ্তমী পূজার দিন) নাটক। নাটক হিসেবে 'তিন পয়সার পালা' সৃজন বিন্যাসে যেন বেশ কিছুটা ভিন্ন, একথা দর্শক সাধারণ কেমন করে যেন বুঝে গিয়েছিলেন। নাট্যকাহিনী বেশ উপভোগ্য। অথচ তাতে পড়তে পড়তে রয়েছে সমাজ জীবনের গভীর স্পর্শ। নাটকে অনিবার্যভাবে উঠে আসে সত্তরের দশকের সেই রাষ্ট্রীয় অভিঘাত। যেখানে দিন দুপুরে পথে-ঘাটে পড়ে থাকতে দেখা যেত মানুষের লাশ। এক কথায় সত্তরের দশকের সেই সামগ্রিক অবক্ষয়কেই এই নাটকে তুলে ধরা হয়েছে।

'তিন পয়সার পালা'-র সাফল্যের পর অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় চেষ্টা করেছিলেন ভিন্ন ধরনের আরো কিছু নাটক মঞ্চস্থ করতে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তাঁর নিজের লেখা মৌলিক নাটক 'হে সময় উত্তাল সময়'। এটি প্রথম অভিনীত হয় ১৯৭১-এর ২৬ সেপ্টেম্বর, রঙ্গনা নাট্যমঞ্চে। এ নাটকে নকশালবাড়ি আন্দোলনের ঘটনার প্রবাহের সঙ্গে মহাভারতের মুষল পর্বের আখ্যানকে মিলিয়ে মিথ এবং একালের এক ছিন্নমস্তা সময়কে মেলাতে চেয়েছিলেন অজিতেশ। ক্ল্যাসিক কাঠামো বজায় রাখার জন্য নাটকটিকে আগাগোড়া অমিত্রাক্ষর ছন্দে নির্মাণ হয়েছিল। এক্ষেত্রে অবশ্য অজিতেশ খুব একটা সফল হননি। তবে একথা বলতেই হয় যে একটি অস্থির সময়কে শিল্পোত্তীর্ণ করে তুলতে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। যদুবংশ ধ্বংস হওয়ার সঙ্গে তিনি সত্তরের দশকের যৌবনের অপচয়ের সমান্তরাল রেখা দুটি দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এরপর একসঙ্গে বেশ কয়েকটি নাট্য প্রযোজনায় হাত দেন। জার্মান নাট্যকার যোসেফ কেসেলরিং-এর 'আর্সেনিক এণ্ড ওল্ড লেস' অনুসরণে করলেন 'বিতংস' (২৭ ডিসেম্বর,১৯৭১), ও জার্মান নাট্যকার ম্যাক্স ফিৎস্-এর 'দ্য ফায়ার রেইর্জাস' অবলম্বনে 'অগ্নিবিষয়ক সতর্কতা ও গৌতম' (২৬ সেপ্টেম্বর,১৯৭২), চিত্তরঞ্জন ঘোষের 'নটী বিনোদিনী' (১৯৭২-এর ৬ ডিসেম্বর), আইরিশ নাট্যকার স্ট্রিন্ডবার্গ-এর 'এরিক টুয়েলভ' অবলম্বনে 'শাহী সংবাদ' (২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪) প্রভৃতি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলো নাটক করবার একমাত্র কারণ 'রঙ্গনা'-য় তখন ব্যবসায়িকভাবে 'নান্দীকার' সপ্তাহে চারটি অভিনয় করার সিদ্ধান্ত নেয়। সুতরাং সেই দায় মেটাতেই প্রযোজনার সংখ্যা বাড়াতে হয়। তবে এতো কিছু করেও শেষ রক্ষা হলো না। 'তিন পয়সার পালা' দিয়ে শুরু হওয়ার বছর পাঁচেকের মধ্যেই ব্যর্থতার বিপুল বোঝা নিয়ে রঙ্গনা থেকে তাঁকে বেরিয়ে আসতে হয়। এরপর অস্থায়ীভাবে হলঘর ভাড়া নিয়ে কিছুদিন তাঁর নাট্যচর্চা চালিয়ে যান। ১৯৭৫-এর ২৫ মার্চ একাডেমি অফ ফাইন আর্টস-র মঞ্চ ভাড়া নিয়ে সেখানে করলেন গ্রিক নাট্যকার সোফোক্লিস-এর কাহিনি 'আন্তিগোনে'। যদিও এই নাটকের নির্দেশনার কাজ করেছিলেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। কিন্তু অভিনেতা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে

মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। ওই একই মঞ্চে ১৯৭৬- এর ৩০ অক্টোবর অভিনীত হয় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক 'সওদাগরের নৌকা'। অভিনেতা, নাট্যনির্দেশকের পাশাপাশি নাটককার অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ এক চরম সিদ্ধি। এইভাবে কিছুদিন থিয়েটার করার পর 'নান্দীকার' ছেড়ে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বেরিয়ে এলেন রাধারণ তপাদার, বীণা মুখোপাধ্যায়, রণজিৎ চক্রবর্তী, সন্ধ্যা দে প্রমুখ গুটিকয়েক নাট্যকর্মীকে নিয়ে। প্রতিষ্ঠা করলেন 'নান্দীমুখ' (৯ই সেপ্টেম্বর,১৯৭৭) নাট্যদল। শুরুতে নান্দীকার-এ অভিনীত নাটকগুলিই 'নান্দীমুখ'-এর জন্য বেছে নেওয়া হয়। পুরোনো নাটকগুলি দিয়েই অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পর্বে তাঁর নাট্যচর্চা শুরু করেন। ২৩ সেপ্টেম্বর,১৯৭৭ 'নানা রঙের দিন' নাটকের নাট্যায়নের মধ্যদিয়ে 'নান্দীমুখ'-এর পথচলা শুরু হয়। এরপর করলেন 'শের আফগান', 'শরতের মেঘ' ও 'সওদাগরের নৌকা'। তবে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বমহিমায় ফিরে এলেন টলস্টয়ের 'পাওয়ার অব ডার্কনেস' অবলম্বনে রচিত 'পাপপুণ্য' নাটকে। নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৭৮-এর ২৮ আগস্ট, শিশির মঞ্চে। সম্ভবত তিনি এই নাটকটিকে ধরতে চেয়েছেন জীবনের নির্মম এক সন্ধিক্ষণে এসে। দেবাশিস মজুমদার এই নাটকের মঞ্চায়ন প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> ''... আত্মদর্শনের প্রভাব বা প্রকাশ এই প্রযোজনাটিতে অত্যন্ত বেশি। ... এক ঝাঁক নতুন নাট্যে অশিক্ষিত ছেলে মেয়েদের দিয়ে অভিনয় করালেন নিজস্ব দক্ষতায়। সেই গ্রাম্য আবহাওয়ায় নাটক ছড়ালো সম্পর্কের অবৈধ বিস্তারে। শেষ পর্যন্ত সেই অন্যায় আত্মদগ্ধে পুণ্য অর্জন করে। কিন্তু এক ধরনের ভয় ছড়িয়ে থাকে গোটা নাট্যটিতে। নির্দেশকের অভিজ্ঞতার প্রাচুর্যে, শিল্পিত উদ্ভাবনে, নাট্য বিন্যস্ত হয় একাধিক মাত্রায়।''[৪৯]

নাটকটিতে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় টলস্টয়ের জীবন দর্শনকে স্মরণীয় ভাবে তুলে ধরেছিলেন গ্রাম বাংলার রূঢ় বাস্তবতার রূপায়ণের মধ্য দিয়ে। পরিবেশ উপযোগী সংলাপ প্রায় প্রতিটি চরিত্রের বিশ্বাসযোগ্য অভিনয় ট্রাজিক চৈতন্যের অমোঘ বিস্তার এবং সর্বোপরি অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালোত্তীর্ণ অভিনয়ের মধ্য দিয়ে 'পাপপুণ্য' বাংলা থিয়েটারে এক চিরায়ত মাত্রা সঞ্চার করে।

'নান্দীমুখ' পর্বে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরবর্তী নাট্যকর্ম হ্যারল্ড পিন্টার-এর 'দ্য বার্থ ডে পার্টি' অবলম্বনে '৩৩-তম জন্ম দিবস'। নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ১৯৮২-র ১৬ জুন, একাডেমি অব ফাইন আর্টস মঞ্চ-এ। এও এক অসাধারণ মঞ্চসফল প্রযোজনা। এই নাটকের মঞ্চায়ন সম্পর্কে রথীন চক্রবর্তী যথার্থই লেখেন—

> ''৩৩-তম জন্মদিবস, গ্রুপ থিয়েটারের ভাটা পড়া চিন্তার ক্ষেত্রে এক দুঃসাহসী

প্রচেষ্টা। সমস্ত নাটকে কোথাও সামান্যতম আবহ নেই, আলোর চতুর প্রক্ষেপণ নেই, পোশাকের বাহাদুরী পর্যন্ত নেই। শুধুমাত্র ঘটনার নৈঃশব্দ এবং সংলাপের উচ্চারণ টেনে নিয়ে গেছে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটককে তার সফল পরিণতির দিকে। ... এই স্পর্ধা যা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন আমাদের সকলের কাছেই এক মস্ত সম্পদ হয়ে থাকবে। — ৩৩-তম জন্মদিবস গ্রুপ থিয়েটার প্রযোজনার ইতিহাসে এক সমৃদ্ধ সংযোজন''।[৫০]

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ে নাট্যপ্রযোজনায় আমরা লক্ষ করি, তিনি প্রায় ধারাবাহিকভাবে বিদেশি নাটকই বেশি মঞ্চস্থ করে গেছেন। নান্দীকার প্রতিষ্ঠার পর বিদেশি নাটকের পাশাপাশি তিনি দু-একটি বাংলা মঞ্চস্থ করেছেন বটে কিন্তু প্রকৃত অর্থে সাফল্য পেয়েছেন বিদেশি নাটকে। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের বক্তব্য ছিল—

''ভালো নাটক পাওয়ার অভাবে দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শ্রেণীর মৌলিক নাটক প্রযোজনার চেয়ে প্রথম শ্রেণীর বিদেশি নাটক প্রযোজনা অনেক বেশি করে কাম্য।''[৫১]

কিন্তু এদেশেও তো প্রথম শ্রেণির নাটকের অভাব নেই। ভারতের আধুনিক নাটককার হিসেবে তখন রবীন্দ্রনাথও স্বীকৃত। শম্ভু মিত্র রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই আধুনিক ভারতীয় থিয়েটারের স্বরূপ অন্বেষণ করেছেন। এছাড়াও সমকালে বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায় লিখে চলেছেন একের পর এক উৎকৃষ্ট মানের নাটক। বাংলার নাট্যরচনার ক্ষেত্রে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনায় এঁদের অবদান তো অনস্বীকার্য। কিন্তু এঁদের কারোর নাটক সম্পর্কেই অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তেমন আগ্রহ ছিল না। দেবাশিস মজুমদার খুব সঙ্গত কারণে তাই বলেছেন, ''ভাবতে ইচ্ছে করে সত্যি যদি কখনও বাদল সরকার কিংবা মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক নিয়ে কাজ করতেন অজিতেশ তবে কি সূচিত হতে পারত আর এক নতুন অধ্যায়? ... ধরমবীর ভারতী, গিরিশ করনড, মোহন রাকেশের কথা ভাবলেন না কেন? ... এই পরিপ্রেক্ষিতেই বোধ হয় অনেকে প্রশ্ন তুলছেন অজিতেশ তাঁর নাটক মঞ্চায়নে নির্দিষ্ট কোনো পথ রেখা কি গ্রাহ্য করতেন? খুঁজে পেতে চেয়েছেন নির্দিষ্ট কোনো দর্শনের মনন বিস্তার এই নির্বাচিত 'বিদেশি' প্রথম শ্রেণীর নাটক গুলির মধ্য থেকে?[৫২] আমাদের মনে হয় এদেশিয় নাটকের ক্ষেত্রে তাঁর কোথাও একটা গোপন বিরোধিতা ছিল। আসলে শম্ভু মিত্র বা উৎপল দত্ত দু'জনেই দীর্ঘদিন কলকাতার থিয়েটার মহলে একটা নাগরিক মঞ্চ অথবা নাগরিক সমাজ গড়ে তোলার প্রয়াস অনুভব করেছিলেন এবং শিল্পচর্চার প্রয়োগ ও নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের সুযোগও সেখানে ছিল। তাঁরা যেমন তাঁদের জীবৎকালের রবীন্দ্রপন্থী আদর্শ অথবা

রাজনৈতিক সচেতনতার গভীরে পৌঁছে বাংলা নাটককে নিয়ে ভেবেছেন ও তার এক বিবর্তিত রূপ তুলে ধরারও চেষ্টা করেছেন। তাঁদেরই কাছাকাছি থেকে অন্য আঙ্গিকে অথচ ঠিক তেমনটাই চেষ্টা করে গেছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ও। বিষয় বৈচিত্র্যে ও ভাবনাগত তাৎপর্যে নতুনত্ব আনতে চেয়েছেন তিনি। সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন বিদেশি নাটকে। তবে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় মূল নাটক থেকে সরাসরি অনুবাদ করেননি, রূপান্তরও করেননি। তিনি স্থানীয়করণ বা লোকালাইজেশন করেছেন। মূল নাটকটিকে তার পটভূমি থেকে তুলে এনে তাকে বাংলার মাটিতে ফেলে দেশ-কাল পরিস্থিতি অনুযায়ী গল্পটিকে, তার চরিত্র,সংলাপ নির্মাণ করেছেন, এখানেই অজিতেশ স্বতন্ত্র। থিয়েটারে কোন বিপ্লব ঘটানো তাঁর অভিপ্রায়ও ছিল না, তিনি এক প্রশ্নের উত্তরে তাই বলেছেন, ''আমরা কেউ নাট্যবিপ্লব করছি না। আমরা মধ্যবিত্তের নাটক, একটু অন্য ধরনের নাটক, একটু ভালো নাটক করার চেষ্টা করছি মাত্র।''[৫৩] আর নান্দীকার কেন শুধু বিদেশি নাটক করে? এ প্রসঙ্গে তাঁর স্পষ্ট উত্তর, ''... একটা ভালো নাটক সারা পৃথিবীর সম্পদ। সেইটা আমি তুলে দিচ্ছি আমার দেশের মানুষের হাতে। দেশি বিদেশি ব্যাপারটা এখানে বড়ো নয়।''[৫৪] অর্থাৎ নাটক নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি দেশি-বিদেশির ভেদাভেদ করতে চাননি। তাঁর কাছে 'ভালো নাটক' করাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে নাট্যাভিনেতা ও নাট্যসংগঠক কুমার রায়ের মূল্যায়ন যথার্থ। তাঁর মতে, ''অজিতেশ তার মত তার নিজস্ব ক্ষমতায় -নিজস্ব বোধের যে প্রকাশ থিয়েটারের মধ্যে দিয়ে করতে চাইছিল সেটা জবরদস্ত ছিল। ঐ লোকটাও ছিল ঐ রকম, খানিকটা জবরদস্ত, Production-এর মধ্যে দিয়ে কোন কিছুকে Care না করেই করেছেন। ব্রেশট্ হল কি হল না তাতে কিছু যায় আসে না—....এবং মজা হচ্ছে ব্রেশটের থিয়োরী হল কি হল না- এই জাতীয় আলোচনা করেন তাঁরাই যাঁরা থিয়েটার করেন না। অর্থাৎ একটা প্রবল বেগ কিন্তু অজিতেশ নিয়ে এসে ছিল। ... সেটাও একটা ধারা তৈরি হলো কিন্তু।''[৫৫]

থিয়েটারের পাশাপাশি যাত্রা শিল্পেও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজস্ব প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন। যাত্রাশিল্পে তাঁর প্রথম পদার্পণ পাতিপুকুর যুবনাট্য সমাজের হয়ে জনৈক জিতেন বসাক রচিত 'মানুষ' যাত্রাপালায়। সেকালের বিখ্যাত যাত্রাদলের মালিক ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র নট্ট কোম্পানির জন্য তিনি লিখেছেন 'নটী বিনোদিনী' পালা। যে পালাটি অভিনয়ে ও অর্থাগমের কারণে যুগান্তকারী রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল। যদিও একটা সময় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে তিনি থিয়েটারই করবেন, যাত্রা করবেন না। কিন্তু ১৯৭৭-এর শেষদিকে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত ও নাট্যজীবনে এক দুর্বিপাক নেমে আসে। এই সময় কেয়া চক্রবর্তীর প্রয়াণ ঘটে। নিজের হাতে-গড়া 'নান্দীকার' থেকেও বেরিয়ে এসেছেন, প্রতিষ্ঠা করেছেন নতুন

নাট্যদল 'নান্দীমুখ'। কিন্তু নতুন একটা দল করবার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক লোকবল কিংবা অর্থবল এমন কোনও সঙ্গতিপূর্ণ নয় যে খুব দ্রুত তার পক্ষে আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো সম্ভব। তাই একপ্রকার বাধ্য হয়েই তাঁকে যাত্রা দলে নামতে হয়। এই পর্বে শুধু অভিনয় নয়, তিনি একই সঙ্গে বিভিন্ন পালা-ও রচনা করেন। 'প্রদীপ অপেরা' নামে একটি যাত্রাদলে 'রত্নাকর গিরিশচন্দ্র ও আনারকলি' পালার নির্দেশক রচয়িতা হিসেবে তিনি যোগদান করার সিদ্ধান্ত নেন। এরপর যোগদান করলেন 'নাট্য ভারতী'-তে। সেখানে করলেন যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে 'রাবণ'।

যাত্রা সম্পর্কে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরই ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। এ সম্পর্কে তাঁর অভিমত হল—

> ''যাত্রা থেকেই বাঙালির নিজস্ব অ্যাকটিং-রীতি আবিষ্কৃত হতে পারে, তিনদিক খোলা মঞ্চের বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব, বিবেকের গানের প্রয়োগ....মাইম ও কোরিওগ্রাফিক প্রয়োগ, দৃশ্যসজ্জার সরলীকরণ সম্পর্কে চিন্তা ও দর্শকদের কল্পনাশক্তি এবং সৃজনশীল মননের প্রসারে সাহায্য করা ছাড়াও তাঁর সর্বশেষ প্রত্যাশা ছিল যাত্রাচর্চার মধ্য দিয়েই ন্যাচারালিজম থেকে থিয়েটারের সামগ্রিক মুক্তি ঘটানো।''[৫৬]

একথা আজ স্বীকার করতেই হবে যাত্রাশিল্পের উপযুক্ত সম্ভাবনাগুলো কিছুটা স্পষ্টতর হয়েছিল তাঁর পরবর্তী বছর খানেকের মধ্যে প্রযোজিত 'তিন পয়সার পালা'-য় কিংবা আরো পরে 'নটী বিনোদিনী'-র নাট্য মতো প্রযোজনায়। এমনকি 'সওদাগরের নৌকা' নামে একটি মৌলিক নাটকও তিনি লিখেছেন, যার কেন্দ্রে রয়েছে একজন প্রবীণ যাত্রা অভিনেতা। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় উপলব্ধি করেছেন যে কলকাতার থিয়েটারের বাইরে, গ্রামেগঞ্জে পড়ে রয়েছে বিরাট জনতা। সেই জনতার কাছে পৌঁছানোর আকাঙ্ক্ষা নিয়েই তিনি যাত্রাদলে নেমেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল তাঁর যাত্রাশিল্পে যোগদানের পরিণতি সুখকর হয়নি। এ প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার দাস লিখেছেন,

> ''কলকাতার থিয়েটারকে বৃহত্তর গ্রামীণ দর্শকদের মুখোমুখি নিয়ে যাওয়ার কল্পনায় কীভাবে কাজ করতে হবে, সে-ভাবনায় অজিতেশ ভাবিত হয়েছেন নানাসময়ে। কিন্তু যাত্রায় যোগদান করে সে-আশা চরিতার্থ করা যায় এমন কোনও ভাবনা তাঁর ছিল না। যেজন্য যাত্রার আসরে *রাবণ*-এর ব্যর্থতার পর যে কঠিন প্রত্যাখানের আঘাত তাঁকে সহ্য করতে হলো, সেটা তাঁর কাছে নিদারুণ মর্মবেদনারই নামান্তর হয়ে উঠেছিল।''[৫৭]

আসলে যাত্রা নিয়ে দীর্ঘদিন যে ধরনের সম্ভাবনার কথা তাঁর মাথায় ঘুরত, এই জনপ্রিয় নাট্যকলা নিয়ে সেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার ইচ্ছা তাঁর ছিল, কিন্তু ব্যবসায়িক রুচিগত প্রশ্নে বাস্তব ক্ষেত্রে তিনি সে বিষয়ে সবসময়ই প্রায় সংকুচিত হয়ে থেকেছেন। যাত্রায় সম্পূর্ণ ব্যর্থতার দায়ভার নিয়েও শেষ পর্যন্ত তিনি চেষ্টা করেছিলেন এত বড় শক্তিশালী মাধ্যমটাকে সঠিক অর্থে বোঝার, তার অগণিত দর্শকের প্রকৃত মনটাকে স্পর্শ করার। 'সওদাগরের নৌকা' নাটকের এক বেদনাবিধুর দৃশ্যে পেশাদার এক যাত্রাকর্মীর সংলাপে অজিতেশের সেই আর্তি যেন আমাদের ভারাক্রান্ত করে :

> ''সূর্য বড়ো তাড়াতাড়ি ডুবে গেল হে- বিষাদসিন্ধুর উত্তাল ঢেউ বড়ো তাড়াতাড়ি গ্রাস করে ফেলল সূর্যকে। কালো ঘোলা চিকচিকে সব ঢেউ- ময়াল সাপের মতো ফুঁসিয়ে উঠছিলো চারদিকে।''[৫৮]

অনেকেই মনে করেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ পর্যন্ত রুজি-রোজগারের জন্যই যাত্রাদলে নাম লিখিয়েছিলেন। কিন্তু অজিতেশ সম্পর্কে এতটা সরলীকরণ ঠিক নয়। আসলে মানবিক মূল্যবোধের প্রতি এক আত্মগত অকৃত্রিম দীক্ষা নিয়ে তিনি থিয়েটারে কাজ করতে গিয়েছিলেন। মহান শিল্পীরা এভাবেই বোধ হয় নিজেদের বারবার পরখ করে দেখেন। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এর ব্যতিক্রম নন। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাট্যভাবনার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে তাঁর অনুজ নাট্যকর্মী দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত যর্থাথই লিখেছেন,

> ''তাঁর দুই পূর্বসূরী শ্রীশম্ভু মিত্র ও উৎপল দত্তের নাট্যধারায় তিনি রিয়ালিজম্ এবং পোয়েট্রির মিশেল দিয়ে নাট্যের এক নবধারা সংযোজন করলেন। বাংলা নাট্যকর্মের ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত দুই পূর্বসুরী যদি হন স্রষ্টা, অজিতেশ তাহলে নাটকের এক উজ্জ্বল রূপকার,নাট্যশিল্পের এক নির্মোহ স্থপতি।''[৫৯]

বাংলা থিয়েটারের উক্ত সমকালীন নাট্যকর্মীদের মধ্যে বাদল সরকারের আবির্ভাব একটি বিশেষ সন্ধিক্ষণে। চল্লিশের দশকে গণনাট্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিজন ভট্টাচার্য যে নাট্যধারার প্রবর্তন করেন পঞ্চাশের দশকে গিয়ে সেই ধারা প্রায় বিস্মৃত হয়ে যায়। তারপর শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত এবং অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতন প্রবল নাট্যব্যক্তিত্বের গ্রুপ থিয়েটারের ধারণা একটা সময় যে ব্যাপক উন্মাদনা নিয়ে বাংলা থিয়েটারের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল, আশির দশকে গিয়ে সেটাও প্রায় বিস্মৃত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে শেখর সমাদ্দারের মূল্যায়ন খুব প্রাসঙ্গিক। তিনি লিখেছেন,

> ''আসলে১৯৭৯-৮০ সালটাই খুব টালমাটাল বাংলা থিয়েটারের পক্ষে।
> এটা শুধু নাট্য গবেষণার জায়গা থেকে নয়, আমাদের থিয়েটারচর্চার

জায়গা থেকেও বলা যায়। বাংলা থিয়েটারের তিন প্রধানের তখন কী অবস্থা? সদ্য বহুরূপী ছেড়েছেন শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত যাত্রা জগৎ পরিক্রমা শেষ করে এবার ব্যস্ত হিন্দি সিনেমা নিয়ে, বছর কয়েক আগে থেকে ডবল ভার্সন ছবি 'অমানুষ' ব্যাপক হিট করার পর কলকাতার থেকেও মুম্বাইতে ভীষণ চাহিদা তাঁর। অজিতেশ নান্দীকারবিচ্যুত হয়েছেন কিছু আগে, নতুন দল করেছেন ঠিকই কিন্তু রুজির জন্য তাঁকে যেতে হচ্ছে যাত্রায়।"[৬০]

বাংলা থিয়েটারের এইরকম একটি সময়ে বাদল সরকার আবির্ভূত হলেন তাঁর তৃতীয় থিয়েটার নিয়ে। যদিও বাদল সরকারের থিয়েটার জার্নিটা অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। প্রচলিত নাটকের আঙ্গিককে স্বীকার করে যেমন তিনি নাটক রচনা করেছেন,তেমনি প্রচলিত প্রসেনিয়াম থিয়েটারের ধারাতেই প্রায় দীর্ঘদিন তিনি তাঁর নাট্যচর্চা করে গেছেন। সবার'ই একটা শুরু থাকে, বাদল সরকারের শুরুটা ওইখান থেকেই হয়েছিল। কিন্তু ক্রমশ বাদল সরকার প্রথাগত নাট্যধারা থেকে সরে এসে নির্মাণ করেছেন স্বতন্ত্র পথ। এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য খুব স্পষ্ট; বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত কিংবা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাট্যদর্শনকে আমরা কখনোই খাটো করে দেখতে রাজি নই। কোন তুল্যমূল্যের বিচার আমাদের লক্ষ্য নয়। আসলে তাঁদেরই প্রবাহমান ধারাবাহিকতায় বাদল সরকার যেটুকু নিজস্ব মাত্রা যোগ করতে সক্ষম হয়েছেন, এখানে সেটুকুই শুধু আমাদের অন্বেষণ করার বিষয়। প্রথমত প্রচলিত নাটকের আঙ্গিক অস্বীকার করা বাদল সরকারের নাট্য আঙ্গিকের অন্যতম লক্ষণ। এটা শুরু হয় 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটক থেকে। কুমার রায় লিখেছেন,

"...'এবং ইন্দ্রজিৎ' থেকে একটা অন্য phase আমরা দেখতে পেলাম এবং সেই phase-এর মধ্যে কিন্তু মানুষ, মানুষের সঙ্কট, individual, সমাজ— এসবগুলোই এল। আর যেটা আসা দরকার ছিল নাটকের মধ্যে। এবং যে প্রচলিত ধারাটা ছিল আমাদের— যে format-এ লেখা হতো তার থেকেও— 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাট্যসাহিত্য হিসাবে ওগুলোর একটা বিশিষ্টতা দেখা গেল। ঐখান থেকে বাদলবাবু কিন্তু form-এর দিক থেকে নাটকে কিন্তু একটা নতুন দিক আনলেন।"[৬১]

তাঁর নাটকে থাকল না প্রচলিত নাটকের মতো কোন অঙ্ক বিভাজন, নাটকে নেই কোন নির্দিষ্ট প্লট। চরিত্রের থাকলো না সুনির্দিষ্ট কোন চরিত্রায়ন। আছে শুধু কিছু নাট্যমূহুর্ত। চাইলেই অভিনেতা-

অভিনেত্রীরা ইচ্ছে মতো চরিত্র বাছাই করতে পারে, আবার নাটকের মাঝখানে চরিত্র বদল করতে পারে। তাঁর নাটকে চরিত্রদের 'স্পেস' বা 'স্থানিক' স্বাধীনতা থাকায় তারা ইচ্ছে মতো ঘুরে ফিরে অভিনয় করেন। তাঁর নাটকে দর্শকেরাও অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতে পারে।

নাটকে দর্শকদের জোরালো ভূমিকা থাকে। যেমন 'প্রস্তাব' নাটকের শেষে একটি দড়ির গিট খুলতে দেওয়া হয় দর্শকদের। উদ্দেশ্য একটাই অভিনেতারা যেমন শারীরিক কষ্টের দ্বারা নাটক উপস্থাপন করেন দর্শকরাও সেই কষ্টের কিছুটা ভাগীদার হোক। তাঁর নাটকের গঠন এবং সংলাপ পরিবেশনা কখনো কখনো অভিনয়ের মূল উপজীব্য হয়ে যায়। নাটকে ব্যবহার করেন একেবারেই ছোট ছোট সংলাপ। অনেক সময় দেখা যায় একই সংলাপ দুটো আলাদা চরিত্রকে দিয়ে বলানো হচ্ছে। আবার একই অভিনেতা ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র অভিনয় করছে।

প্রচলিত নাটক রচনার রীতি থেকে বাদল সরকার যেমন সরে এসেছেন তেমনি নাট্যায়নের ক্ষেত্রেও প্রসেনিয়াম থিয়েটারের রীতি থেকে সরে এসেছেন, যা তৃতীয় ধারার থিয়েটার নামে পরিচিত। এ বিষয়ে আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পূর্ণাঙ্গ অন্বেষণ করেছি। এখানে শুধু এর উল্লেখ এই কারণেই আমরা করছি তাঁর প্রবর্তিত তৃতীয় ধারার থিয়েটার বাংলা তথা ভারতীয় থিয়েটারের ইতিহাসে অভিনব। সমকালীন ভারতীয় নাট্যকারদের মধ্যে সত্যদেব দুবে, কন্নর নাট্যকার প্রসন্ন, মহেশ এল কুঞ্চওয়ার, গিরিশ কারনাডের মতো নাট্যব্যক্তিত্বরা বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এবং কোনো না কোনো দিক থেকে তাঁরা যে বাদল সরকারের নাট্যায়নের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন সে কথাও স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বাদল সরকারের তৃতীয় ধারার থিয়েটার ভীষণ ভাবে স্বীকৃত। কিন্তু আমাদের আলোচ্য সমকালীন নাট্যকর্মীদের মধ্যে প্রায় কেউ'ই বাদল সরকারের নাট্যকর্ম নিয়ে যে খুব একটা উচ্চশিত প্রশংসা করেছেন এমনটা আমরা লক্ষ করি না। শম্ভু মিত্র বাদল সরকারের বেশকিছু নাটক তাঁর বহুরূপীর নাট্য দলে করেছেন— কিন্তু ওই পর্যন্তই। বাদল সরকারের তৃতীয় ধারার নাটক সম্পর্কে তেমন কোন বক্তব্য আমরা শম্ভু মিত্রের থেকে পাইনি। বাদল সরকারের তৃতীয় ধারার থিয়েটার সম্পর্কে উৎপল দত্তের ধারণা কোন কালেই ভালো ছিল না, বরং তাঁকে নিন্দা করতেই আমরা দেখেছি। ''উৎপলবাবু বলেছিলেন— লোকটা থিয়েটার করতে জানে না, তাই শারীরিক কসরৎ দেখিয়ে আসর দখল করতে চাইছে।''[৬২] অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রায় একই রকম ধারণা পোষণ করেছেন বাদল সরকারের নাটক এবং নাট্যায়ন সম্পর্কে। তিনি লিখেছেন, ''... আমাদের দেশে উক্ত থার্ড থিয়েটার চর্চার শ্লোগান চলতি থিয়েটারের বিকল্প হিসেবে স্রেফ্ ফ্যাসান বলে মনে হয়। ... আসলে থার্ড থিয়েটার আবার মধ্যবিত্তদের নয়া খেলনা।''[৬৩] অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক সময়ের সহকর্মী নান্দীকারের সদস্য রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

রথীন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে এক আলাপচারিতায় বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটারের সমালোচনা করে বলেছেন—

> ''বহু শতাব্দী ধরে বহু গবেষণা, বহু অধ্যয়ন এবং অজস্র চিন্তাভাবনার ... মধ্য দিয়ে মঞ্চ, আলো, আবহ সঙ্গীত, পোশাক, সংলাপ ইত্যাদির যাবতীয় আবিষ্কারকে নিয়ে গড়ে উঠেছে যে বিশেষ ধারা বা পদ্ধতি, তা কোনো ব্যক্তির কাছে অসুবিধে জনক মনে হওয়ায় অমনি সেটা তুলে দেও— এই সোরগোল তোলা নিছক প্রতিক্রিয়াশীলতা ছাড়া কিছুই নয়। ইট ইজ কমপ্লিটলি রিঅ্যাকশনারী।''[৬৪]

এর বাইরেও সমকালে অনেকেই বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটার সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা করেন। এবং বেশিরভাগ সমালোচনাই হয়েছে বাদল সরকারের নাটক দেখে নয় তাঁর 'থার্ড থিয়েটার' গ্রন্থটির উপর ভিত্তি করে। কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার বাদল সরকারের তৃতীয় ধারা থিয়েটার শেষ পর্যন্ত ওই একটি গ্রন্থের উপর আটকে থাকেনি। তার কারণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারের প্রয়োগরীতিরও বহু পরিবর্তন ঘটেছে, সেই বিষয়ে আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। একটা সময় থার্ড থিয়েটার নিয়ে যখন বাদল সরকারকে নানা রকম ভাবে আক্রমণ করা হয়, সেই সময় বাদল সরকার বলেছেন—

> ''... অহেতুক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ, চরিত্রহনন, মিথ্যা রটনা, ব্যক্তি কুৎসা আমার উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা একধরনের রুচিবিকার। থিয়েটার তো জীবন্ত কলামাধ্যম; দর্শক ও অভিনেতার সরাসরি যোগাযোগের সেতু। তাই মুষ্টিমেয় শ্রেণীর জগত থেকে কক্ষচ্যুত হয়ে অগণিত মানুষের সত্যের গহনে আমি আত্মপ্রবেশ করেছি। প্রোসেনিয়ামের নিরাপদ দুর্গ থেকে ব্রাত্য হয়ে উন্মুক্ত আকাশের নীচে 'মুক্তমঞ্চে' এবং ক্লিবিয়ান 'অঙ্গনমঞ্চে' ব্রতী হয়েছি। সেই হিসাবে আমার চরিত্র বদল হয়েছে। আমার শ্রেণী-অবস্থান পাল্টেছে। আমার গোত্রান্তর হয়েছে।''[৬৫]

বাদল সরকারের তৃতীয় ধারার থিয়েটার সম্পর্কে যতই সমালোচনা থাকুক না কেন বাংলা তথা ভারতীয় থিয়েটারের ইতিহাসে তাঁর অবদান কোন ভাবেই অস্বীকার করা যায় না। থিয়েটারের বাঁধাধরা পথ থেকে সরে এসে তিনি নির্মাণ করেছেন নাট্য আন্দোলনের এক নতুন ইতিহাস। আমরা এই আলোচনার ইতি টানবো সুধন্ব দেশপাণ্ডে-এর একটি মূল্যবান বক্তব্য দিয়ে। তিনি লিখেছেন, ''... প্রথাগত প্রাতিষ্ঠানিক নাট্যভূমির বাইরে অন্য নাট্যভূমিতে উন্নত-মানের থিয়েটার নিয়ে যাওয়ার

কাজে তাঁর অবদান বিপুল। সফদার হাশমি যাকে 'ভারতীয় থিয়েটারের গণতন্ত্রীকরণ' বলেছেন, সেই প্রক্রিয়ায় বাদল সরকার ছিলেন এক দিগ্‌দর্শক ব্যক্তি।"[৬৬]

তথ্যসূত্র:

১. দাশ, ভবেশ : অজিতেশ, 'সম্পাদকের কথা' অংশ থেকে উদ্ধৃত, পরম্পরা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০১৭,কল ৯, পৃ. ১৭

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : থিয়েটারের আকাশে নক্ষত্রমালা,সায়ক নাট্যপত্র , বিশেষ সংকলন সংখ্যা, ২০১১, কলকাতা, ৪৭,পৃ-৩৪

৩.তদেব : পৃ. ৩৫

৪. দে, সন্ধ্যা : অন্যধরার থিয়েটার উৎস থেকে উজানে, মৌহারি, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ, ১৪১৪,কল-৩২, পৃ.১৫

৫. তদেব : পৃ. ৭৯

৬. তদেব : পৃ. ২২৫

৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : থিয়েটারের আকাশে নক্ষত্রমালা, সায়ক নাট্যপত্র , বিশেষ সংকলন সংখ্যা, ২০১১, কলকাতা, ৪৭,পৃ. ৩৬

৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : থিয়েটারের আকাশে নক্ষত্রমালা,সায়ক নাট্যপত্র , বিশেষ সংকলন সংখ্যা, ২০১১, কলকাতা- ৪৭, পৃ. ৩৬

৯. রক্ষিত, মলয় : বাংলা থিয়েটার অন্য ইতিহাস,সিনেট প্রেস, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর,২০১৭, পৃ.১১৬-১৭

১০. রায়, কুমার : বহুরূপী, ৮৩ নং সংখ্যা, ১ মে-জুন, ১৯৯৫, শম্ভু মিত্রর সঙ্গে সুবীর রায় চৌধুরীরসাক্ষাৎকার, পৃ-১৪৭

১১. Pradhan, Sudhi : Marxist Cultural Movement in India, Chronicles and Documents-Vol.-I, Pustak Bipanani, Kol,1st Edition, July1979, p-159

১২. সুবীর রায়চৌধুরীর সঙ্গে শম্ভু মিত্রের সাক্ষাৎকার ,২৫ এবং ২৬ আগস্ট ১৯৭৬, দুটি অধিবেশনে শম্ভু মিত্রের সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়। বহুরূপী নাট্যপত্রে প্রকাশিত এই সাক্ষাৎকারটি, পুর্নমুদ্রিতহয় সায়ক নাট্যপত্রে, সেখান থেকেই শম্ভু, মিত্রের বক্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা

হয়েছে,নবপর্যায়, সংখ্যা,৪ (১২), ২০০৫, পৃ.৬৪

১৩. শম্ভু মিত্র : প্রসঙ্গ নাট্য, 'নাটুকে দলের সমস্যা' শীর্ষ প্রবন্ধ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর,১৯৭১, পৃ. ১৬

১৪. সুবীর রায়চৌধুরীর সঙ্গে শম্ভু মিত্রের সাক্ষাৎকার ,২৫ এবং ২৬ আগস্ট ১৯৭৬, দুটি অধিবেশনে শম্ভু মিত্রের সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়। বহুরূপী নাট্যপত্রে প্রকাশিত এই সাক্ষাৎকারটি, পুর্নমুদ্রিতহয় সায়ক নাট্যপত্রে, সেখান থেকেই শম্ভু, মিত্রের বক্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে, নবপর্যায়, সংখ্যা,৪ (১২),২০০৫, পৃ. ৬৮

১৫. দে, সন্ধ্যা : অন্যধরার থিয়েটার উৎস থেকে উজানে, মৌহারি,প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ, ১৪১৪,কল ৩২, পৃ.২৩

১৬. রক্ষিত, মলয় : বাংলা থিয়েটার অন্য ইতিহাস,সিনেট প্রেস, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর,২০১৭, পৃ. ১৫০

১৭. তদেব : পৃ.১৫০

১৮. দে, সন্ধ্যা : অন্যধরার থিয়েটার উৎস থেকে উজানে, মৌহারি, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ, ১৪১৪, কল ৩২, পৃ. ২৯

১৯. দত্ত, সুনীল : নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর ১৯৪২-১৯৮৬, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, প্রথম প্রকাশ ১৩ই সেপ্টেম্বর'৭২, কল-১২, পৃ. ৭৫

২০. মিত্র, শম্ভু : 'ফিরে তাকাই' বহুরূপী ৭০, বিশেষ বহুরূপী প্রযোজনা ২, অক্টোবর ১৯৮৮,পৃ. ১৭০

২১. দে, সন্ধ্যা : অন্যধরার থিয়েটার উৎস থেকে উজানে, মৌহারি, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ, ১৪১৪, কল-৩২, পৃ. ৩৮

২২. সুবীর রায়চৌধুরীর সঙ্গে শম্ভু মিত্রের সাক্ষাৎকার ,২৫ এবং ২৬ আগস্ট ১৯৭৬, দুটি অধিবেশনে শম্ভু মিত্রের সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়। বহুরূপী নাট্যপত্রে প্রকাশিত এই সাক্ষাৎকারটি, পুর্নমুদ্রিতহয় সায়ক নাট্যপত্রে, সেখান থেকেই শম্ভু, মিত্রের বক্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে, নবপর্যায়, সংখ্যা, ৪ (১২),২০০৫, পৃ.৭৩

২৩. তদেব : পৃ.৭১

২৪. সুবীর রায়চৌধুরীর সঙ্গে শম্ভু মিত্রের সাক্ষাৎকার, ২৫ এবং ২৬ আগস্ট ১৯৭৬, দুটি অধিবেশনে শম্ভু মিত্রের সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়। বহুরূপী নাট্যপত্রে প্রকাশিত এই সাক্ষাৎকারটি, পুর্নমুদ্রিতহয় সায়ক নাট্যপত্রে, সেখান থেকেই শম্ভু, মিত্রের বক্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে, নবপর্যায়, সংখ্যা, ৪ (১২),২০০৫, পৃ. ৮১

২৫. মিত্র, শম্ভু : প্রসঙ্গ নাট্য 'বাঙলার নবনাট্য আন্দোলন' শীর্ষক প্রবন্ধ শীর্ষক প্রবন্ধ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর,১৯৭১,পৃ. ১৩০

২৬. তদেব : পৃ.১২৯

২৭. তদেব : পৃ.১৩০

২৮. রক্ষিত, মলয় : বাংলা থিয়েটার অন্য ইতিহাস, সিগনেট প্রেস, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর,২০১৭,১৯৬২-তে বহুরূপী পত্রিকায় শম্ভু মিত্রের সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ছদ্ম নামে 'নব-নাট্য আন্দোলন' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। মলয় রক্ষিত সেই প্রবন্ধের কিছু অংশ উক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। এখানে সেটি তুলে ধরা হয়েছে, পৃ. ১৬০

২৯. সাহা, নৃপেন্দ্র : নাট্য আকাদমি পত্রিকা-৬, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা নাটক ও থিয়েটার সংখ্যা '৯৯,-এ প্রকাশিত সৌমিত্র বসুর 'স্বাধীনতা উত্তর বাংলা নাট্য প্রয়োগের ধারা' প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত, প্রকাশকাল মার্চ, ১৯৯৯, পৃ.১৬৮

৩০. দত্ত, উৎপল : আমার রাজনীতি আমার থিয়েটার, 'লিটিল থিয়েটার ও আমি', নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, জানুয়ারি,২০০৫,পৃ.১৪

৩১. তদেব : পৃ.২০

৩২. দে, সন্ধ্যা : অন্যধরার থিয়েটার উৎস থেকে উজানে, মৌহারি, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ, ১৪১৪,কল-৩২, পৃ. ৪৮

৩৩. তদেব : সন্ধ্যা দে তাঁর উক্ত গ্রন্থে 'স্বাধীনতা' পত্রিকার সমালোচনাটি উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সেটি এখানে তুলে

ধরা হল। পৃ. ৫০

৩৪. ভৌমিক, তাপস : কোরক, বাংলা নাটক ও নাটক মঞ্চ, দর্শন চৌধুরী তাঁর 'উৎপল দত্তের মঞ্চভাবনা ও অভিনয়' শীর্ষ প্রবন্ধে ধূর্জটিপ্রসাদের মন্তব্য উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এখানে সেটিই তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম প্রকাশ,শারদ, ২০১৩, পৃ. ৩৯১

৩৫. দত্ত, উৎপল : আমার রাজনীতি আমার থিয়েটার, 'লিটিল থিয়েটার ও আমি', নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, জানুয়ারি, ২০০৫,পৃ. ২৮

৩৬. তদেব : পৃ. ৩৮

৩৭. ভৌমিক, তাপস : কোরক, বাংলা নাটক ও নাটক মঞ্চ, দর্শন চৌধুরী তাঁর 'উৎপল দত্তের মঞ্চভাবনা ও অভিনয়' শীর্ষ প্রবন্ধে ধূর্জটিপ্রসাদের মন্তব্য উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এখানে সেটিই তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম প্রকাশ, শারদ, ২০১৩, পৃ.৩৯৩

৩৮. তদেব : পৃ. ৩৯৩-৩৯৪

৩৯. দে, সন্ধ্যা : অন্যধরার থিয়েটার উৎস থেকে উজানে, মৌহারি, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ, ১৪১৪,কল-৩২, পৃ. ৬৮

৪০. দত্ত, উৎপল : আমার রাজনীতি আমার থিয়েটার, 'লিটিল থিয়েটার ও আমি', নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, জানুয়ারি, ২০০৫, পৃ.৩৮

৪১. দত্ত, উৎপল : থিয়েটারের ভাষা, গদ্য সংগ্রহ ১, নাট্যচিন্তা, সম্পাদনা শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৯৮, পৃ.১১৭-১১৮

৪২. তদেব : পৃ. ৭৮-৭৯

৪৩. সাহা, নৃপেন্দ্র : নাট্য আকাদমি পত্রিকা-৬, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা নাটক ও থিয়েটার সংখ্যা '৯৯-এ প্রকাশিত সৌমিত্র বসুর 'স্বাধীনতা উত্তর বাংলা নাট্য প্রয়োগের ধারা' প্রবন্ধ থেকে

উদ্ধৃত, প্রকাশকাল মার্চ, ১৯৯৯, পৃ.১৬৮-১৮১

৪৪. মুখোপাধ্যায়, কুন্তল ও সাহা সুশীল: অনুষ্টুপ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক, চতুস্ত্রিংশ: ২য় ও ৩য়, যুগ্ম সংখ্যা ২০০০,অনুষ্টুপ, দেবাশিস মজুমদারের 'অহঙ্কারের শেষ নায়ক; শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে গৃহীত, পৃ. ৩৯৫

৪৫. তদেব : পৃ. ৩৯৫-৯৬

৪৬. তদেব : পৃ. ৩৯৬

৪৭. তদেব : পৃ. ৩৯৬-৩৯৭

৪৮. তদেব : পৃ. ৩৯৭-৩৯৮

৪৯. তদেব : পৃ.৪০৩

৫০. দে, সন্ধ্যা : অন্যধরার থিয়েটার উৎস থেকে উজানে, মৌহারি, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ, ১৪১৪, কল-৩২, পৃ.২৮১। সন্ধ্যা দে তাঁর 'অন্য ধারার থিয়েটার: উৎস থেকে উজানে' গ্রন্থে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের '৩৩-তম জন্মদিবস' নাটকটির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে ১১ই নভেম্বর ১৯৮২ 'সত্যযুগ' পত্রিকায় প্রকাশিত রথীন চক্রবর্তীর লেখাটি থেকেউদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। আমরা সেটি প্রায় অপরিবর্তিত রেখে এখানে তুলে দিয়েছি।

৫১. মুখোপাধ্যায়, কুন্তল ও সাহা সুশীল: অনুষ্টুপ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক, চতুস্ত্রিংশ: ২য় ও ৩য়, যুগ্ম সংখ্যা ২০০০,অনুষ্টুপ, দেবাশিস মজুমদারের 'অহঙ্কারের শেষ নায়ক; শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে গৃহীত, পৃ. ৪০৪

৫২. তদেব : পৃ.৪০৫

৫৩. দাশ, ভবেশ : অজিতেশ, অভিক চট্টোপাধ্যায়ের 'নিভৃত প্রাণের দেবতা' শীর্ষক রচনাংশ থেকে উদ্ধৃত, পরম্পরা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০১৭, কল- ৯, পৃ. ৯৪

৫৪. তদেব : সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যতটুকু তাঁকে জানি' শীর্ষক রচনা থেকে উদ্ধৃত। পৃ.১৩৭

৫৫. মুখোপাধ্যায়, কুন্তল ও সাহা সুশীল: অনুষ্টুপ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক, চতুস্ত্রিংশ: ২য় ও ৩য়, যুগ্ম সংখ্যা ২০০০,অনুষ্টুপ, দেবাশিস মজুমদারের 'অহঙ্কারের শেষ নায়ক; শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে গৃহীত, পৃ. ২২৮-২২৯

৫৬. দাশ, ভবেশ : অজিতেশ, প্রভাত কুমার দাসের 'অজিতেশ : তাঁর ক্ষণিক যাত্রাজীবন' শীর্ষক রচনাংশ থেকে উদ্ধৃত, পরম্পরা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০১৭, কল-৯, পৃ. ৩৪৪

৫৭. তদেব : পৃ. ৩৫৫

৫৮. তদেব : পৃ. ৩৬১

৫৯. তদেব : 'সম্পাদকের কথা' শীর্ষক অংশ থেকে রচনাটি উদ্ধৃত। পৃ. ২১

৬০. ভাদুড়ি, সত্য : পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমি পত্রিকা (১৬), বাদল সরকার স্মারক সংখ্যা, শেখর সমাদ্দারের 'বাদল সরকার ও তাঁর থিয়েটার কোন এক বিপন্নবিস্ময়' শীর্ষক প্রবন্ধ, প্রথম প্রকাশ ২সেপ্টেম্বর,২০১৪, পৃ.২১৮

৬১. মুখোপাধ্যায়, কুন্তল ও সাহা সুশীল: অনুষ্টুপ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক, চতুস্ত্রিংশ: ২য় ও ৩য়, যুগ্ম সংখ্যা ২০০০,অনুষ্টুপ, 'বিষয় নাট্যসৃজন: নির্মাতার মুখোমুখি' কুমার রায়, পৃ. ২৩০-২৩১

৬২. মিত্র বন্দীকিশোর ও মুখোপাধ্যায় সবুজ : বাদল সরকার-এর রুদ্ধশ্বাসৎ সাক্ষাৎকার, থিয়েটার বুলেটিন পত্রিকার ১৯৮০-র জুলাই-আগস্ট সংখ্যায় উৎপল দত্ত ছদ্ম নামে বাদল সরকারের তৃতীয় ধারার থিয়েটার সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। বন্দী কিশোরকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বাদল সরকার সেই সমালোচনার কথা বলতে গিয়ে মন্তব্যটি করেছেন। ঊনজন, প্রথম প্রকাশ জুলাই,২০১১, পৃ.২১-২২

৬৩. রায়, দেবাশিস : থিয়েটারি তর্ক থিয়েটার বিতর্ক, কালিন্দী ব্রাত্যজন, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১৩,পৃ-৩১৯-৩২০

৬৪. দত্ত, সুনীল : নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর ১৯৪২-১৯৮৬, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, প্রথম প্রকাশ ১৩ই সেপ্টেম্বর ৭২, কল-১২, পৃ. ৩৯৯

৬৫. তদেব : পৃ. ৩৫২

৬৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, শমীক : বাদল সরকার: এবং ইন্দ্রজিৎ থেকে র্থাড থিয়েটার, থীমা, প্রথম প্রকাশ,২০১৭, পৃ. ২৩৯-২৪০